Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারনে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রত্না পারভীন

রোলঃ 216020015

২৪ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যে কারনে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ মামুনুর রশীদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রত্না পারভীন

রোলঃ 216020015

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “যে কারনে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয়” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রত্না পারভীন, আইডিঃ 216020015 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: মামুনুর রশীদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যে কারনে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: মামুনুর রশীদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রত্না

(স্বাক্ষর)

রত্না পারভীন

আইডিঃ 216020015

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৪ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য এবং দুরুদ ও সালাম কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হোক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) , তার পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহর দীনের প্রতি আহবানকারী এবং ঐ সমস্ত লোকদের উপর যারা কুরআনের ঝান্ডাকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করেন।

Topic-যে কারনে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহনযোগ্য নয়

ভূমিকা:

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত অনেক ধর্ম বিদ্যমান। যেমনঃ ইসলাম, খ্রিস্টান, হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি।

যারা যে ধর্ম মানে তারা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে।এতোগুলো ধর্মের সবগুলো তো একসাথে সঠিক হতে পারে না। এখন দেখার বিষয় যে কোন ধর্ম সঠিক!আর সঠিক ধর্মটাই আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। সত্য অনুসন্ধান ও তা গ্রহন করা প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তির কাজ। কেউ যদি সত্য অনুসন্ধানে পা বাড়াই তাহলে সত্য পর্যন্ত পৌছে দেওয়া সৃষ্টিকর্তার দায়িত্ব। আর আমরা যদি মনের সকল বক্রতা দূরে রেখে সরল, নিরপেক্ষ মন ও বিবেক কাজে লাগায় তাহলে আমরা সত্য ও সঠিক ধর্মের পথ পেয়ে যাব ইন শা আল্লাহ।

মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা:

মনবজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষ যদি তার জীবনে সকল চাহিদা যথাযথভাবে পূরন করে তারপরও মানুষ সমাজে স্থিরতা লাভ করতে পারে না। কেননা মানসিক, সামাজিক চাহিদা পূরন হলেও আত্নিক চাহিদার ঘাটতি থেকে যায়। আর আত্নিক চাহিদাই মানুষের প্রশান্তির মূল। অর্থাৎ আত্নিক ইবাদত দ্বারা মানুষের মন শান্তি লাভ

করে। আর এই প্রশান্তিই মানুষকে স্থিরতা দান করে। এজন্য ধর্মহীন বা নাস্তিক মানুষ সবসময় হতাশাগ্রস্থ, অস্থিরতায় ভোগে। এটার প্রভাব সমাজেও পড়ে। একসময় সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এজন্য সমাজে সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ন বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল চাহিদার পাশাপাশি আধ্যাত্নিক ইবাদতের প্রয়োজন এবং ধর্মের বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।

অন্যান্য ধর্ম সৃষ্টি হল কীভাবে?

বাবা আদম(আ:) প্রথম মানুষ। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছে, সেই বিবেক বুদ্ধিকে আল্লাহ কিভাবে কাজে লাগাতে চান তা বলে দেয়ার উদ্দেশ্যে তথা মানুষের সঠিক জীবন ব্যবস্থা কি হবে তা বলে দেয়া ও শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ দূতকে পাঠান।

আর তা পাঠানোর ধারা হলো যখন যে ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তখন সেই ধরনের সমাধান দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ দূতকে পাঠিয়েছেন।

এ ভূ-পৃষ্ঠে অনেক নবি-রাসুল এসেছিলেন, যাদের অনেকের নাম আমাদের জানা নেই। হয়ত হতে পারে যে, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগে তারা নবি-রাসুল ছিলেন এবং তাওহীদের প্রচারক ছিলেন। পরবর্তীকালে নবীকে গোড়ামীর বশবর্তী হয়ে মানতে না পেরে, তারা নবীর অনুসারী থাকার নাম করে নিজের মনমত বানানো নতুন ধর্ম সৃষ্টি করে। যেমনঃ মুসা(আঃ)-এর কিছু উম্মত গোড়ামির কারনে পরবর্তী নবি ঈসা(আঃ) কে মানতে না পেরে তারা ইহুদি জাতিতে পরিনত হয়। ঠিক একই কারনে ঈসা(আঃ) এর উম্মত পরবর্তী ও শেষ নবি ও রাসুল মুহাম্মদ(সাঃ) কে মানতে না পেরে খ্রীস্টান জাতিতে পরিনত হয়।

এভাবেই বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মুসলিম জাতি এমন একটা কথায় বিশ্বাস করি, যা অন্য কোনো জাতিই বিশ্বাস করতে পারে না।পারলে তাদের ধর্মও টিকে না, তা হচ্ছে যে, আমরা সকল নবিকেই মানি। কিন্তু অন্য কোন জাতি সব নবি-রাসুলকে মানতে পারে না। আমরা সকল নবিকেই মানতে পারি আর কিভাবে মানি তা একটা উদাহরন দিয়ে বুঝার চেষ্টা করি।

যেমনঃ আমাদের ভারত উপমহাদেশ এমন একদিন ছিল যে দিন বৃটিশ সরকারের রাজত্ব ছিল। তখন আমরা প্রত্যেকেই বৃটিশ সরকারের নাগরিক ছিলাম। পরে যখন পাকিস্তান এলো তখন পাকিস্তান সরকারের নাগরিক ছিলাম। তারপর এল বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে আমরা বাংলাদেশ সরকারের নগরিক।

এখন আমরা প্রত্যেকেই বৃটিশ সরকার ও পাকিস্তান সরকার মানি, কিন্তু আইন মেনে চলি বর্তমান সরকারের। এই সরকারের আমলে যদি কেউ দাবি করে যে আমি বৃটিশ সরকারের আইন মেনে চলব এবং বর্তমান সরকারের আইন মানব না, তাহলে সে ব্যক্তি যে পর্যায়ের অপরাধি হবে ঠিক একই পর্যায়ের অপরাধী হবে তারা যারা বর্তমানে শেষ নবির আমলে পুর্ববর্তী নবির আইন মেনে চলতে চাইবে। আমরা মুসলিম জাতি সকল নবিকেই মানি। যেমন এ উপমহাদেশের প্রত্যেকেই বৃটিশ সরকারকে তদানিন্তন আমলের সরকার বলে মানে ঠিক ধর্মেও ব্যাপারেও ঐ একই নীতি মেনে চলতে অর্থাৎ আমরা যদি ঈসা(আঃ) বা মুসা(আঃ) এর যুগের মানুষ হতাম অবে তাদের আইন আমাদের মেনে চলতে হত।নইলে আবশ্যই আমাদের নরকবাসি হতে হত। কিন্তু যেহেতু আমাদের জন্ম হয়েছে শেষ নবির আমলে তাই আমাদের মেনে চলতে শেষ নবিকেই।

সব ধর্মই কি সঠিক?

যারাই কোন না কোন ধর্ম মানে তারা সকলেই মনে করে তার ধর্মটাই সঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, একই ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাক্তির বিভিন্ন প্রকার বিপরীতমুখী দাবির সবগুলোই কি ঠিক হতে পারে? একই অংকের একাধিক উত্তর যেমন ঠিক হতে পারে না, সেরূপ একই সৃষ্টিকর্তার দেওয়া ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিপরীতমুখী দাবির সবগুলোই কি ঠিক হতে পারে না, এটাই যুক্তিযুক্ত।

অনেকের ধারনা নিজ নিজ ধর্ম পালন করলে প্রত্যেক জাতির লোকই পরকালে মুক্তি পাবে। কিন্তু এই ধারনা কি ঠিক? এর সঠিক উত্তর পেতে হলে আপনাকে গভিরভাবে চিন্তা করতে হবে। আল্লাহর নিকট মানুষের পরিচয় কি জাতি হিসেবে, না কি মানুষ হিসেবেই?

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট মানুষের পরিচয় মানুষ হিসেবেই।লক্ষ্য করলে দেখা যায় আল্লাহর প্রত্যকটি ব্যবস্থা মানুষের জন্য একইভাবে কাজ করছে।যেমনঃ দেখুন, প্রত্যেক খাদ্যবস্তুই প্রত্যেক জাতির জন্য একইপ্রকার। ঠিক তেমন রোগ চিকিৎসার বেলায়ও একই ঔষধের প্রয়োজন হয়।

মনে রাখতে হবে আল্লাহর দেওয়া আবহওয়া যেমন প্রত্যকের জন্যই ঠিক তেমনই আল্লাহর দেওয়া ধর্ম প্রত্যেকের জন্যই সঠিক। আল্লাহর দেওয়া চাদ-সূর্য যেমন কোন গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয়, তেমন আল্লাহর ধর্মও কোন গোষ্ঠী বিশেষের নিজস্ব কিছু নয়।

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার শর্তাবলি

কোনো মতাদর্শ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হতে হলে তাতে নিম্নোক্ত শর্তাবলি বর্তমান থাকতে হবেঃ

১. তাতে স্রষ্টার পরিচয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক বক্তব্য থাকতে হবে।

২. তাতে অদৃশ্য বিষয় সমুহ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন সমূহের যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক জবাব থাকতে হবে।

৩. মানুষের মৃত্যুর পর কী হবে, সে বিষয়ে সঠিক, যুক্তিসংগত ও সন্তোষজনক জবাব থাকতে হবে।

৪. সেটি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং গোপন ও প্রকাশ্য সর্বজান্তা প্রদত্ত হতে হবে।

৫.মানব জীবনের সাফল্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত থাকতে হবে এবং তা মানুষের মানসিক প্রশান্তির কারন হতে হবে।

৬. মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যার্থতা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

৭.মানব জীবনে উদ্ভুত সকল সমস্যার সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা ও মূলনীতি থাকতে হবে।

৮.'সৃষ্টি যার বিধান তার' - সেটি এই শাশ্বত মূলনীতি ভিত্তিক হতে হবে।

৯.মানুষের জৈবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরনের বিধি ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. জীবনের সকল বিভাগ পরিচালনার মূলনীতি ও নির্দেশিকা থাকতে হবে।

১১. সেটি সার্বজনিন মানুষের উপযোগী হতে হবে।

১২. সর্বকালীন উপযোগী হতে হবে।

১৩.অনুশীলন ও অনুসরন করার এবং বাস্তবায়ন করার উপযোগিতার নমুনা থাকতে হবে।

১৪. যুগ সমস্যার সমাধানের উপযোগী নীতিমালা থাকতে হবে।

১৫.সততা, অন্যায়, ন্যায়নীতি, পুণ্যকর্ম, পরোপকার ও ধার্মিকতার জন্য পুরষ্কার লাভের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৬.একজন সার্বভৌম এবং সর্বশক্তিমান অথরিটি থাকতে হবে।

১৭. তার সম্পুর্ন ওবিকৃত ও সাশ্বত সোর্স অব নলেজ থাকতে হবে।

[রেফারেন্সঃ ইসলাম পুর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাঃআব্দুস শহীদ নাসিম]

বর্তমান বিশ্বে যতো ধর্ম প্রচলিত আছে, তার কোনোটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা নয়। ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম কেবল কতিপয় নৈতিক, আধ্যাত্মিক উপদেশই দিয়ে থাকে। মানব জীবনের বিশাল রাজনৈতিক, অর্থনৈক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক, আইন ও বিচার বিভাগীয়, কৃষি ও শিল্পনীতি সম্পর্কীয় কোনো বিধানই সেগুলোতে পাওয়া যায় না।

অপদিকে বিশ্ব যেসব ধর্মহীন আধুনিক মতবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলো সবগুলোর ভিত্তিই স্রষ্টা ও ধর্ম বিবর্জিত বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া তার প্রত্যেকটি কোনো একটি খন্ডিত দার্শনিক চিন্তা ভিত্তিক। মানুষের পূর্নাঙ্গ জীবনকে নিয়ে সেগুলোর কোনো বক্তব্য নেই।

সে হিসেবে বর্তমান বিশ্ব প্রচলিত বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান কিংবা অন্যান্য ধর্ম, এছাড়া ধর্ম্নিরপেক্ষতাবাদ, হেগেঈয় ইতিহাস দর্শন এবং অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ কোনোটি মানুষের পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তো নয়ই, সাধারন জীবন ব্যবস্থা হবার যোগ্য নয়।

মানুষের জীবন ব্যবস্থা এবং পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য এ সবগুলোতে অনুপস্থিত।

পরকালের মুক্তির পথ একটিই

ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; দ্বীন, মুসলিম ধার্মিক হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা একমাত্র সত্য ধর্ম বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু কুরআন মাজীদে ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, اِنَّ الدِّیۡنَ عِنۡدَ اللّٰہِ الۡاِسۡلَامُ’নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম। ‘ (সুরা আল ইমরান আয়াত ১৯)

وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡہُ ۚ وَ ہُوَ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ

‘আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ‘ (সুরা আল ইমরান আয়াত ৮৫)

বর্তমানে কিছু শিক্ষিত মানুষ বলে বেড়ায়, সকল ধর্ম সঠিক। আমরা সব ধর্মকে স্বস্থানে সঠিক মনে করি। এখন যার যার ধর্ম পালন করলে মুক্তি পেয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে সুরা কাফিরুনের শেষ আয়াত দিয়ে তারা এ সাপেক্ষে দলিল দিয়ে থাকেন। তাদের এই দাবি একবারে অবান্তর। কুরআন ও হাদিসের অর্থ ও উদ্দেশ্য নেয়ার ক্ষেত্রে মনগড়া বিষয় যেন না হয়ে যায় এ বিষয়ে সকলেই লক্ষ্য রাখা কাম্য। কেননা ্নবীবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান না রেখে তাফসীর করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়। (মুসনাদে আহমাদঃ৪/২৫০)

এই আয়াতের তাফসীরে হয়রত মাওলানা ছানাউল্ললাহ রহ. লেখেন, ‘এই আয়াতটি মূলত পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়গুলোকে দৃঢ়তর করার জন্য। উদ্দেশ্য হল, তোমরা তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করবে না, আর আমরাও আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করবো না’ । (তাফসীরে মাযহারীঃ১০/৩৫৫)

‘সবাই যাআর যার ধর্ম পালন করবে’ এ তাফসীর ও উদ্দেশ্য গ্রহন করা মারাত্নক ভুল। কেননা, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরও নবীজী অসংক্ষ্য কাফেরকে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং কাফেররাও মুসলমানদের ইসলাম মানার কারনে নানাভাবে নির্যাতন করেছে। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের আলোকে উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, বর্তমান যুগে পরকালে মুক্তির জন্য ধর্ম হিসেবে

ইসলাম ধর্মকেই বেছে নিতে হবে। মুক্তির পথ কেবল ইসলামই। অন্যন্য ধর্ম অনুসারীদের মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহন ব্যতিত মুক্তির অন্য কোন পথ খোলা নেই।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্ম ও মতবাদসমূহ

ইয়াহুদি ধর্ম পরিচিতিঃ

ইয়াহুদি শদবটি আরবি কিংবা অনারবি এ নিয়ে বিস্তর মত পার্থক্য আছে।

১.যারা শব্দটিকে আরবি বলেন, তারা এ নামটি নিয়ে মতভেদ করেছেন।

· কেউ কেউ বলেন এটি আরবি শব্দ 'হাওদ' থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ তাওবা ও প্রত্যাবর্তন। কুরআনে মূসা(আ:) এর অনুসারীদের মুখ থেকে এ শব্দটি বের হয়েছিলো। বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আমরা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম" ।

· কেউ কেউ বলে, শব্দটি আরবি শব্দ থেকে গৃহিত। যার অর্থ ঝুকে পড়া। কারন তারা তাওরাত পাঠের সময় আগে-পিছে ঝুকে পড়ত।

২. পক্ষান্তরে যারা এই শব্দটিকে আনারবি বলেন, তারাও ইয়াহুদি শব্দের মূল কি তা নির্নয়ে কয়েকটি মত পেশ করেছেন। যেমনঃ

· বনী ইসরাঈলের এক গোষ্ঠী নেতা ইয়াহুযা এর সন্ধন্ধযুক্ত করেই এ নাম দেওয়া হয়েছে। কারও কারও মতে লোকটি ইয়া' কুব (আঃ) এর পুত্র। কারও কারও মতে এর পরবর্তী কোনো বিখ্যাত লোক।

· কেউ কেউ বলেন, ইয়াহুদি ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Judism। ইসরাঈলীগণ যেহোভাকেসমগ্র বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর মনে করেন।ইয়াহুদি ধর্মে সৃষ্টি কর্তাকে YHWH ও বলা হয়।

অথবা সুলাইমান(আঃ) এর পরে ফিলিস্তিনে যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম ছিল ইয়াহুদি রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে ইয়াহুদি বলা হয়। এই মতটি অধিক প্রাধ্যপ্রাপ্ত মত; কারন, ইয়াহুদি নামটি এ ধর্মের অনুসারীদের গ্রন্থে পাওয়া যায় না।তবে এই নামটি সর্বপ্রথম উল্লেখ হয়েছে তাদের প্রসিধ যাজক আজরা গ্রন্থে।

তাদের প্রসিদ্ধ যাজক বা আজরা গ্রন্থে।

পারিভাষিক অর্থে ইয়াহুদিঃ

প্রচলি দৃষ্টিতে তাকালে আমরা তাদের একটি সজ্ঞায়বলতে পারি যে তারা হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায় যারা মনে যে তারা মুসা(আঃ) এর অনুসারী।

কেউ কেউ বলেন, ইয়াহুদি বলতে বুঝায় ঐ ধর্মের অনুসারীদের যারা হিব্রু ভাষাভাষি ইব্রাহিম(আঃ) এর 'আসবাত' বা বংশধর বলে পরিচিত।

কুরআনে তাদের যে সমস্ত নাম এসেছে তা হচ্ছে,'কাওমে মূসা' , 'বনী ইসরাইল' , 'আহলে কিতাব' , এবং 'ইয়াহুদি' । তবে ইয়াহুদি নমটি তাদের নিন্দা জ্ঞাপনের থানেই শুধু উল্লেখ হয়েছে। প্রশংসা জ্ঞাপনার্থে অন্যান্য নামগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

ধ্রমতত্ত্বের ইতিহাসো বিভিন্ন ধর্মের স্বরূপ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীর অতি প্রাচীন ধর্মগুলির মধ্যে এই ধর্ম অন্যতম একটি। এই ধর্মের প্রথম গুরুত্বপূর্ন পুরুষ হলেন, মোসেস বা মূসা(আঃ)।

কিন্তু ইয়াহুদিদের এ নামকরন মূসা(আঃ) এর মৃত্যুর অনেক পরে করা হয়েছিল। বিশেষ করে ইয়াহুদিদের ব্যাবিলন এর কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফিলিস্তিনে আসার পর তাদের এ নামকরন করা হয়। সুতরাং কোনো ক্রমেই এটা বলা যায় না যে, ইয়াহুদি ধর্ম ইব্রাহিম বা মূসা(আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত। কারন তারা দু' জন সহ সকল নবীই ইসলামের অনুসারী ছিলেন। ইব্রাহিম(আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ اِبۡرٰهِيۡمُ يَهُوۡدِيًّا وَّ لَا نَصۡرَانِيًّا وَّ لٰكِنۡ كَانَ حَنِيۡفًا مُّسۡلِمًا ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ "ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" ।(সূরা আলে ইমরানঃ ৬৭) মূসা (আঃ) নিজেও মুসলিম ছিলেন এবং দীন ইসলামের প্রতিই মানুষকে আহবান করতেন।

ইয়াহুদি ধর্ম প্রতিষ্ঠার পটভূমিঃ

ইয়াহুদি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মূসা(আঃ) এর নাম বলা হয়ে থাকলেও মূলত এটি মূসা(আঃ) পরবর্তীতে অনেক পরে বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যে বর্তমান রূপ লাভ করে। মিসর থেকে মুসা(আঃ) এর সাথে বের হওয়ার পর বনী ইসরাইলরা ইউশা ইবনে নূন এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। সেখানে তারা বিচারপতিদের দ্বারা শাসিত হত। পরবর্তীতে দাউদ(আঃ) ও তার পুত্র সুলাইমান (আঃ) এরসময় তারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর সুলাইমান(আঃ) এর পুত্রগন রাজত্বকে "ইসরাইল ও ইয়াহূদ" এ দু' ভাগে বিভক্ত করে শাসন করতে থাকেন। পরবর্তীতে তাদের উপর বিভিন্ন পরাশক্তি আক্রমনে তারা সম্পুর্নরূপে পর্যদস্ত হয়ে পড়ে।সম্রাট সারজুন খ্রিশটপূর্ব ৭২২ সাএ তাদের ইসরাইল শাখার উপর দখলদারিত্ব কায়েম করে তাদের আজত্ব কবজা করে নেয়। এতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে তাদের ইয়াহুদি শাখা মিশর ফির' আউনের দ্বারা খ্রিশটপূর্ব ৬০৩ সালে আক্রান্ত হয়ে পর্যদস্ত হয়ে পড়ে। এরপর বখতন্সর নামীয় দিগ্বিজয়ী অত্যাচার শাসক তাদের সবাইকে বন্দী করে ইরাকের ব্যবিলনে নিয়ে আসে। এভাবেইয়াহুদি রাষ্ট্র কাঠামো সম্পূরূপে বিপুপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের এ অবস্থা খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এ সব রাজনৈতিক উথুন-পতন ও অত্যাচারে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতও হারিয়ে ফেলে।তারপর তাদের উপর গ্রিক সম্রাট আলেক্সজেন্ডার শাসন প্রিতিষ্ঠিত হয়।তারপর রোমান সম্রাট বম্বি খ্রিস্টপুর্ব ৬৪ সালে আক্রমন করে সম্পূর্নরূপে বাইতুল মাকদিস ধ্বস করে। এসব আকমেন্র কারনে তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সঠিক আকিদা যা মুসা(আঃ) কতৃক প্রবর্তিত ছিল তা ধরে রাখতে ব্যার্থ হয়।এ সময়ই তাদের এই ধর্মটি পুরোহিতদের হাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের ওবস্থা পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ ঈসা(আঃ) কে প্রেরন করেন।কিন্তু তারা নবিকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ নবিকে উঠিয়ে নেন।

ইয়াহুদি ধর্মগ্রন্থঃ

তাদের ধর্মগ্রন্থ মৌলিকভাবে ২টি।

১.তাওরাত

২.তালমূদ

তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আরো একটি গোপন কিতাবের অনুসরন করে থাকে। তার নামঃ

৩. প্রটোকল।

আকিদা-বিশ্বাসঃ

১. তারা নিজেদেরকে কিতাবের অনুসারী বলে বিশ্বাস করে থাকে।

২. একেশ্বরবাদে বিশ্বাসিঃ ইয়াহুদি ধর্ম একেস্বরবাদে বিশ্বাস করে। এই ধর্মানুসারে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

৩. ঈশ্বরকে ব্যাক্তি হিসাবে বিশ্বাসিঃ তারা ঈশ্বকে ব্যাক্তি হিসেবে মনে করে। ঈশ্বর হচ্ছেন ব্যাক্তিসত্ত্বা, তার চেতনা শক্তি আছে এবং তাকে সর্বশক্তিমান এবং সর্ববিরাজমান কল্পনা করা হয়।

৪. ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষে বিশ্বাসীঃ ইয়াহুদী ধর্ম ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত মহাপুরুষে বিশ্বাসি।

৫. প্রত্যাদেশে বিশ্বাসীঃ ইয়াহুদি ধর্ম ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য তথা নবিদের নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী।

৬. কর্মবাদে বিশ্বাসীঃ ইয়াহুদি ধর্মে কর্মবাদে বিশ্বাসী।

৭.ইয়াহুদি ধর্ম বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর অনেকগুলো মানুষ একসাথে তৈরি করে দিয়েছে এবং জন্মের পর এক একটি মানুষ এক একটি দেহ ধারন করে।

৮. পুনরুত্থানে বিশ্বাসীঃ ইয়াহুদি ধর্ম দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাসী।

৯. তারা জেরুজালেমকে ঈশ্বরের প্রিয় স্থান মনে করে

১০. স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাসীঃ ইয়াহুদি ধর্ম স্বর্গ ও নরকে বিশ্বাসী

১১.জগতের ধারনাঃ ইয়াহুদি ধর্মনুসারে এ জগত বাস্তব ও স্থায়ী।

১২.মূর্তি পূজার বিরোধীঃ ইয়াহুদি ধর্ম মূর্তি পূজার বিরোধি।

১৩.এই ধর্মে মানুষের জীবন চলার বহু দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

১৪.কট্টরপন্থীঃ ইয়াহুদি ধর্ম অত্যন্ত গোড়া।

১৫. চরমপন্থীঃ ইয়াহুদি ধর্ম গ্রহন করা সম্ভব নয়।এই ধর্মের অনুসারী ছাড়া অন্য কেউ গ্রহন করতে পারবে না।আবার ধর্ম ত্যাগ করাও সম্ভব নয়।তাই এ ধর্ম চরম্পন্থী।

খ্রিস্টধর্ম

পরিচিতিঃ

খ্রিস্টধর্ম অনুসারীদেরকে কুরআন ও রাসুলের সুন্নায় নাসারা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নাসারা নামটি 'নাসরানা' নামক জনপদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত।যেখানে ঈসা মসীহ(আঃ) জন্মগ্রহন করেছিলেন। এ ছাড়াও কুরআনে আল্লাহ তাদের 'আহলুল কিতাব' ও 'আহলুল ইঞ্জিল' নামে ভূষিত করেছেন।

কিন্তু এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদের ঈসা(আঃ) এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে মসীহী বা খ্রিস্টান হিসেবে দ্দাবি করে। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ এমনকি ঈসা(আঃ) ও তাদের সঙ্গিদের এই নাম দেননি। যা তাদের ধর্মগ্রন্থে কোথাও উল্লেখ নেই।সর্বপ্রথম ৪২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তাকিয়া জনপদে তাদেরকে অন্যদের পক্ষ থেকে এ নামে ডাকা হয়েছিল।

কোন কোন খ্রিস্টান পন্ডিত মনে করেন যে, সর্বপ্রথম যখন তাদেরকে এই নামে ডাকা হয়েছিল তখন তা ছিল নিন্দা বা গালমন্দ পর্যায়ের। অতএব তাদেরকে আহলে কিতাব বা নাসারা নামে অভিহিত করায় শ্রেয় ও যুক্তিযুক্ত। কেননা; ঈসা(আ:) এর প্রতি তাদের সম্বন্ধ করা সর্বতোভাবে ভুল।

বর্তমান পৃথিবীর বৃহৎ ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম অন্যতম। খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসী খ্রিস্টান নামে পরিচিত এবং তারাই খ্রিস্টান যারা যীশু খ্রীষ্ট বিশ্বাস করেন। খ্রিস্ট ধর্মের আদি ইতিহাস থেকে লক্ষ্য করা যায় যে বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের মত এই ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আধুনিক যুগে প্রচ্য সভ্যতার সঙ্গে এই ধর্মে সংযোগ ঘটেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার মাধ্যমে এই ধর্ম মানব জাতির এক বৃহত্তর অংশের উপর তার প্রভাব বিস্তারিত করেছে। বর্তমান যুগে খ্রিস্ট ধর্মের সমর্থক বৃন্দের সংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার এক বৃহত্তর অংশ।

খ্রিস্টানদের দৃষ্টিতে খ্রিস্টধর্ম:

খ্রিস্ট ধর্মের সাধারণ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ম্যাকডোনাল বলেন; এই ধর্ম হল ইহুদী ধর্ম মতের উপর ভিত্তি করে খ্রিস্টের দ্বারা প্রবর্তিত একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম যে ধর্মে খ্রিস্টোকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ বলে গণ্য করা হয়েছে, যে ধর্মে খ্রিস্টের আত্নোৎসর্গমূলক মৃর্ত্যুর দ্বারা মানবজাতির প্রায়শ্চিত্ত অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই ধর্ম খ্রিস্টের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কোন ধরা বাধা নিয়মের বা বিধির উপর এ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়।

খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যীশুর জীবন ও ক্রিয়াকলাপই খ্রিস্ট ধর্মের উৎস। কাজেই তা বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম বা কুনফুসিয়াসের প্রচারিত ধর্মমতের মতোই একটি ঐতিহাসিক ধর্ম। হাস্টন স্মিথ বলেন, খ্রিস্টধর্ম মূলত একটি ঐতিহাসিক ধর্ম। এর অর্থ হল এ ধর্মের ভিত্তি মূলত কতগুলি সার্বিক নীতি নয়; বরং মুর্ত ঘটনা, বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার উপরই এ ধর্মের ভিত্তি।

প্রতিষ্ঠাতা:

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, যীশু খ্রীষ্টই খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক। অথচ ঈসা কখনো ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের প্রতি আহ্বান জানান নি। তার অনুসারী হাওয়ারীগণও ইসলামের উপর ছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছে: فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيۡسٰى مِنۡهُمُ الۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ اَنۡصَارِىۡۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الۡحَـوَارِيُّوۡنَ نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَ اشۡهَدۡ بِاَنَّا مُسۡلِمُوۡنَ ‏ “অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরী উপলব্ধি করল, তখন বলল, ‘কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে’ ? হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম’ । (সূরা আলে ইমরান ৫২)

মূলত খ্রিস্টধর্মটি শৌল নামক নব-দ্বীক্ষিত ধর্মান্তরিত এক লোক যে পরে নিজেকে সেন্ট পল নামে পরিচয় দিয়েছে সেই সর্বপ্রথম ঈসা প্রকৃত অনুসারী হাওয়ারিদের বিরোধিতা করে বিভিন্ন নতুন আকিদা বিশ্বাসের প্রবর্তন করে ইসা মসিহ বা যীশুখ্রীষ্ট এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে এর নামকরণ করেন খ্রিস্ট ধর্ম।

ধর্মগ্রন্থ:

১। বাইবেল: এটি খ্রিস্টানদের ধর্ম প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থটির দুটি ভাগ আছে -পূর্ব খন্ড ও অন্ত খন্ড। পূর্ব খণ্ডে যিশুর জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ইসরাইল জাতির ইতিহাস আছে, অন্তখন্ডে আছে যীশুর জীবনী ও যিশুর শিষ্যদের কার্যকলাপের বিবরণ। এছাড়াও পল লিখিত বিভিন্ন তৃতীয় তাদের ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত।

২।বিভিন্ন ধর্মীয় সম্মেলন

এই সমস্ত সম্মেলন দু'ভাগে বিভক্ত;

ক. আঞ্চলিক

খ. আন্তর্জাতিক। এগুলোর মধ্যে আটটি সম্মেলন উল্লেখযোগ্য।

আকিদা বিশ্বাসঃ

- সব খ্রিস্টানই বিশ্বাস করেন যে, যিশুখ্রিস্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটেছে।

- খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে তাদের ধর্ম মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।

- খ্রিস্টধর্ম যীশুর উপদেশ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

- মানবজাতির ত্রাতা বা রক্ষাকর্তা হিসেবে যার আবির্ভাব হবে বলে ইহুদীরা আশা করেছিল যীশুকে সেই প্রত্যাশিত দাতা রূপে গণ্য করে 'খ্রিস্ট'   উপাধি তার উপর প্রত্যাপর্ন করা হয়।

- নাজারাথে যীশুর ভক্তদেরই প্রথম খ্রিস্টান নামে অভিহিত করা হয়। ইহুদী ধর্মের সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মে গভীর সম্পর্ক বর্তমান এবং প্রথম খ্রিস্টানরা ছিল সবাই ইহুদি।

- খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের যে স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তা হল এইঃ ঈশ্বর অনন্ত ও অসীম, ঈশ্বর এক অসীম সত্তা। ঈশ্বর এই পদটি যে সত্যাকে নির্দেশ করে, সে সত্তা হলো সব সত্তার উৎস এবং ভিত্তি।

-ত্রিত্ববাদ খ্রিস্ট ধর্মের বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টানদের মতে ঈশ্বরের তিন রূপ- পিতা ,পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর পিতা, স্রষ্টা সকল কিছুর আদি উৎস হিসেবে তিনি যীশুর মধ্যে এবং পবিত্র আত্মা হিসেবে তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং আমাদের আত্মার

মধ্যে বিরাজমান।যীশু খিস্টকে খ্রিস্টানরা ঈশ্বরের পুত্রকে জানেন এবং বলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার।

-খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন যে একই ঈশ্বরের সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমশক্তি সম্পন্ন তিনটি রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে- পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। খ্রিস্টানরা একেকশ্বরবাদী হিসেবে এক ঈশ্বরের বিশ্বাস করে এবং তবুও এক ঐক্যের মধ্যে তিনের বিভেদের কথা বলে- পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

- খ্রিস্ট ধর্মের দুটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় হলো- ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট। তারা উভয়ে একই মূল নীতিতে বিশ্বাসী কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রোটেস্ট্যান্টরা মনে করেন যে মানুষ তার পথে চলার জন্য সকল সময় শুধুমাত্র বাইবেলের উপর নির্ভর করবে। এছাড়াও তাদের আরো একটি সম্প্রদায় রয়েছে যাদেরকে বলা হয় অর্থডেক্স যারা কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করার দাবি করে থাকে।

পৌত্তলিক ধর্মসমূহ

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বিভিন্ন দিনের অনুসারীদের বিবরণ দেয়ার পর “আর যারা শিক করেছে”   বলে বিশ্বের যাবতীয় শিরকি ধর্ম সমূহ কে একত্রে উল্লেখ করেছেন। চাই সেগুলো অস্তিত্ব কুরআন নাযিলের সময় থাকুক বা তারপর পরবর্তীতে সৃষ্টি হোক। আল্লাহর এ ব্যাপক বাণীকে মূল ধরে আমরা আলোচ্য গ্রন্থে দিনের আলোচনা বিবৃত করেছি। সেই লক্ষ্যে উপযুক্ত দিনগুলো ব্যতীত অন্যান্য সকল দিন বা ধর্মকে একত্রে আমরা এ পরিচ্ছেদের অধীনে আলোচনা করেছি।

পৌত্তলিক ধর্মগুলোর সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত ধর্ম সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলোকে আমরা অনুসারী অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. ব্যাপক পৌত্তলিক ধর্ম যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, কুনফুসিয়)

২. আঞ্চলিক পৌত্তলিক ধর্মসমূহ। যেমনঃ জৈন, তা্ও ,শিনত, শীখ।

প্রথমেই আমরা ব্যাপক পৌত্তলিক ধর্মসমূহের আলোচনা করছি।

১. হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্মের পরিচিতিঃ

বর্তমান বিশ্বের ধর্ম গুলির মধ্যে হিন্দু ধর্ম অন্যতম। ভারত বর্ষ হিন্দু ধর্মের উৎসভূমি। হিন্দু ধর্মের উদ্ভব কখন ঘটেছিল সেই সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মে উদ্ভব যে বেশ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ঘটেছে এবং হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ধর্ম গুলির মত যে অন্যতম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রাচীনকালে হিন্দু ধর্ম আর্যধর্ম নামে পরিচিত ছিল এবং এর অনুগামীগনদের আর্য বলা হতো। অনুরূপভাবে প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান বলে এর অপর নাম সনাতন ধর্ম এবং বেদ এই ধর্মের মূল বলে এর অন্য নাম বৈদিক ধর্ম।

আর্যগণ ভারতে এসে প্রথম 'সপ্তসিন্ধু' প্রদেশে বাস করেন। পারসিকগণ 'সপ্তসিন্ধুকে ' বলতেন 'হপ্তহিন্দু' । তার 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করতেন। তাদের এই 'হপ্তহিন্দু' থেকে ভারতে আর্যদের নাম হয় হিন্দু। কাজেই হিন্দু নাম পারশিকদের দেওয়া। বেদ, স্মৃতি, পুরাণে হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। তারপর সপ্তসিন্ধু থেকে আর্যরা ক্রমশ উত্তর ভারতের ছড়িয়ে পড়ে যাকে আর্যাবর্ত নামে অভিহিত করা হত। কাল ক্রমে হিন্দু ধর্ম থেকে দুটি বৃহৎ ধর্মের উদ্ভব ঘটে- জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম।

হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা:

হিন্দু ধর্মের একক সংখ্যা নিরূপণ করা খুবই কঠিন কাজ. এর কারণ কোন সুনির্দিষ্ট একটি মাত্র বিশেষ চিন্তাধারা পরিণতি হিন্দু ধর্ম নয়। তারপরও অনেকেই হিন্দু ধর্মের বেশ কিছু সংগা নির্ধারণ করেছেন। যেমন স্বামী স্ত্রী বিষ্ণু শিবা নন্দ গিরি রচিত 'হিন্দু ধর্ম প্রবেশিকা' গ্রন্থি হিন্দু ধর্মের কয়েকটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

- ভারতে উদ্ভূত কোন ধর্মে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি হিন্দু।

-সিন্ধু নদ থেকে সাগর পর্যন্ত সুবিস্ত্রিত ভারত ভূমিকে যিনি পিতৃভূমি ও পুণ্য ভূমি স্বীকার করেন, হিংসায় যার চিত্ত ব্যথিত হয় তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

-বেদে স্বঃপ্রমিত ও সঃসিদ্ধ সত্যরাজি নিহিত, এ কথা যিনি বিশ্বাস করেন তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

- ই ভেঙ্কটরত্নম হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন, যেসব ব্যক্তি ইসলা্ম, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পার্শী, ইহুদী বা জগতের অন্য পরিচিত যে-সব ধর্ম তার অন্তভুক্ত নয় এবং তাদের উপাসনার রূপ একেশ্বরবাদ থেকে ফেটিশবাদ পর্যন্ত প্রসারিত এবং যার ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাদের হিন্দু রুপে এবং তাদের আবলম্বিত ধর্মকে হিন্দুধর্ম্রূপে গণ্য করা হবে।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস মহাশয় তার 'Hinduism' গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তা খুবই প্রানিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, হিন্দু ধর্মের কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ হিন্দু ধর্ম পরিপূর্ণভাবে অনির্দিষ্ট।

আমরা হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞায় এটিই বলব যে হিন্দু ধর্ম হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু অধিবাসী এবং এখানে আগত কিছু লোকের ধর্ম যারা হিন্দু পিতা মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং হিন্দু ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছেন বলে ঘোষণা করেনি। অথবা যারা অহিন্দু পিতা মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও হিন্দু ধর্মে প্রবেশের ঘোষণা দিয়েছেন এবং ধর্ম থেকে বের হওয়ার কোন ঘোষণা দেননি।

প্রতিষ্ঠাতাঃ

কোন একজন মাত্র নির্দিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক বা ঈশ্বরের অবতার বা মনি, ঋষি বা ধর্ম সংস্করকের সুমহান বাণীর উপরই এ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোন মানববিশেষ হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন করেননি অপরপক্ষে প্রাচীন যুগের মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগে একাধিক ভারতের মুনি- ঋষি সত্য দ্রষ্টা আচার্য এবং ভক্তের বিচিত্র ধর্মসম্বন্দীয় নৈতিক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা ও উপমহাদেশের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

রাধা কৃষ্ণ বলেন, 'হিন্দু ধর্ম কোন সুনির্দিষ্ট গোত্রের প্রতি নির্দেশ করে না বরং তা বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতার ফল বা হিন্দু চিন্তাধারা বিকাশে সহযোগিতা করেছে' ।

ডঃ আহমদ শালাবী বলেন, "হিন্দু ধর্মের ভিত্তি হল আর্যদের বিশ্বাস; যা তাদের ভারতবর্ষের দিকে ক্রমা গমনের পথে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিশ্বাসের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে বিশেষত ইরানি বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে তৈরি হয়েছিল" ।

তাই কোন কোন গবেষক এ ব্যাপারে একটি পরিষ্কার মন্তব্য করে বলেছেন যে, "হিন্দু ধর্ম মূলত বিশ্বাস বিষয়ক ধর্ম পদ্ধতির চেয়ে জীবন পরিচালনা পদ্ধতির বেশি কাছাকাছি" ।

অতএব এ ধর্মে বিভিন্ন মনি ঋষির বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গ্ বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার একত্র সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত হিন্দু ধর্ম হল এমন একটি ধর্ম যে ধর্মে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আবার এক একটি পৃথক ধর্মের উৎস হতে পারে। সেই কারণে একই হিন্দু ধর্মের বাহ্যত বহু ধর্মের একত্রে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে একই হিন্দু ধর্মের মধ্যে শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম একত্রে উপস্থিতি ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ:

প্রায় প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অপর নাম শাস্ত্র ।হিন্দু শাস্ত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রত্যেক ধর্মে একাধিক ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র থাকলেও তার মধ্যে একখানা সিদ্ধশাস্ত্র থাকে। হিন্দু ধর্মের সিদ্ধ শাস্ত্র হল বেদ। বৈদিক যুগের হিন্দু ঋষিগণ বেদকে ভিত্তি করে যুগোপযোগী কতগুলি শাস্ত্র রচনা কর। যেমন, স্মৃত্ সংহিতা, ইতিহাস, পুরা্ আগাম এবং ষড় দর্শন। এগুলো উল্লেখযোগ্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থ।

মানবতা অতীতে ও বর্তমানে অনেক মতবাদ পর্যবেক্ষণ করেছে। রাজনীতিতে গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্র এবং অর্থনীতিতে সমন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম ইত্যাদি। রাজনৈতিক মতবাদ গুলো রাজনীতিকে মুখ্য ও অর্থনীতিকে গৌণ মনে করে এবং অর্থনৈতিক মতবাদ গুলো অর্থনীতিকে মুখ্য ও মানব জীবনের একমাত্র বুনিয়াদ মনে করে রাজনীতিকে গৌণ বিবেচনা করে। মানব জীবনকে ব্যাপকভাবে অধ্যায়ন না করার ফলে এসব ভারসাম্যহীন চিন্তা ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

রোমান সমাজ ব্যবস্থা

অতিত ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা রোমান সভ্যতা ও জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখতে পাই যা দীর্ঘদিন গোটা ইউরোপকে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং যার মূল ভিত্তি ছিল দাস প্রথা। এই সভ্যতাই স্বাধীন রোমান মানুষের চাইতে দাসের সংখ্যা বেশি পেতে থাকে। রোমান আইন অনুযায়ী ভিন্ন দেশে যাদের সাথে তাদের কোন চুক্তি ছিল না রোমানেরা নির্বিঘ্নে তাদের ক্ষমতা দখল করে নিতে পঋত। রোমানদের জন্য বিশেষ ধরনের আইন আর অ-রমানদের জন্য ছিল নিকৃষ্ট ভিন্ন আইন, যাকে "দুর্বলের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি বিধানকারী জাতীয় আইন" নামে অভিহিত করা হয়। যেমন এক আইনে ছিল যে কেউ যদি কোন সতী, বিধবা বা কিংবা কুমারীর সাথে অসুদ্দেশ্যে চরিতার্থ করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক হয় তাহলে তাকে নিজ মালের অর্ধেক জরিমানা দিতে হবে এবং নিচ বংশের লোক হলে তাকে বেত্রাঘাতের পর দেশান্তর করতে হবে। রোমানরা অস্ত্রের বলে প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকায় বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠলে সর্বত্র বিরহের আগুন জ্বলে ওঠে।

সামন্তবাদ

এ মতবাদ রাজনৈতিক দিক থেকে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তোলে। শাসক শ্রেণী হচ্ছে সামন্ত বাদের মুকুটমনি ও সর্বস্ব। তারপরের মর্যাদা হল সম্ভ্রান্ত লোক ও গির্জার পাদ্রী, তারপর পেশাদার শ্রেণী এবং সর্বশেষ মর্যাদা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও শ্রমিকদের।এই শ্রেণীর লোকেরা ছিল ভুমি দাস। ভূস্বামীর পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষক এবং জমি কার জমির মালিকানাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থনৈতিক বিচারে ভুমি ছাড়া এ ব্যবস্থা সম্পদ বলতে অন্য কিছু থাকে না যার মালিকানা ভুসামীদের পূর্ণ করতলগত। কৃষকরা তাদের মধ্যে বন্টিত জমি চাষ করবে এবং ভুসামীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করবে। সামন্ত প্রভু অভূতপূর্ব প্রভাবের অধিকারী হওয়ায় তাদের চেস্তায় গির্জা গুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আমরা দেখেছি খৃষ্টবাদ ইউরোপে দীর্ঘদিন এ অনুসারীদের ওপর, “শাসক কাইজারের যা প্রাপ্য আমি তাকে তা দিব এবং আল্লাহকে তার যা প্রাপ্য তা দেব” এই স্লোগানের ভিত্তিতে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল এবং এরই ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রোমান শাসকদের মর্জি মতো নিয়ন্ত্রিত হত। যার ইউরোপ তার অধিবাসীদের শান্তির নিশ্চয়তা বিধানকারি জীবন ব্যবস্থা উপহার দিতে হয় ব্যর্থ হওয়ায় দুঃখ কষ্টে জড়িত হয়ে ওঠে। মুসলমানগন ৭১৭ সালে কনষ্ট্যান্টিনোপল ও ৭৩২ সালে ফ্রান্সের পরপাটিয়া বিজয়ের ফলে ইউরোপের প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনীতি ব্যবস্থা সম্পন্ন পর্যদস্ত হয়ে পড়ে।

একদিকে মুসলমানদের স্পেন বিজয় ও অন্যদিকে অনবরত ইউরোপবাসীদের ক্রুসেড পাশ্চাত্য জাতিকে তদানীন্তন সভ্যত্র ধারক মুসলমানের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু গির্জা কর্তৃক সৃষ্ট গোড়ামীর ফলে তারা মুসলমানদের ঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। তথাপি তার ১৪শ শতাব্দী থেকে ১৬ শতাব্দীর এই দুই শতকে মুসলমানদের চিন্তাধারা থেকে নবজীবনের প্রচুর সামগ্রী লাভ করে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রকৌশল বিদ্যা, ও জ্যোতির্বিদাসহ অন্যান্য বিষয় বর্ধিত জ্ঞান লাভ করে তাদের আধুনিক ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিষর অধিকতর সম্প্রসারিত হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ উপরও লিখিত এই নতুন আন্দোলনের সূচনা হয়। রাষ্ট্রে বর্তমান আইন ও সমস্ত প্রভুদের গির্জার অভিভাবকত্ব এই নব্য গোষ্ঠীর বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা বিজ্ঞান ও সমাজের সব কিছুতে বিস্তার লাভ করে, অবশেষে এটা গির্জার ক্ষমতাকে খর্ব করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এই ফলশ্রুতি স্বরূপ ইউরোপে নতুন এক সুর ধনীতে হয় যে, রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। আর এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং এখান থেকে প্রথমবারের মতো সুদ ও তার বৈধতা সম্পর্কে আওয়াজ উঠে। অথচ প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধর্মের এই সুদ নিষিদ্ধ ছিল।

শিল্প বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক বিকাশের ফলে ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজনেরা বিজ্ঞানের এই নব আবিষ্কার থেকে সর্ব প্রথম লুটতে থাকে। কেননা তারাই তখন সম্পদ ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। ফলে তারা এই নব্য আবিষ্কার কলা কৌশল ও প্রশাসনিক যোগ্যতা কে কাজে লাগে 'পুঁজিবাদ' নামক শিল্প ও ব্যবসার এক নতুন ব্যবস্থার জন্ম দেয়

পুজিবাদ

মূলত পুঁজিবাদের জন্ম হয় ব্যবসায়ী, সুদখো্ পেশাদার বিজ্ঞানী এই বুযুর্গা শ্রেণী সমূহ কে অস্বাভাবিক ক্ষমতা ও সমন্তবাদ ও গির্জা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কারণে। জাতির কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর নির্যাতিত হওয়াও এর অন্যতম কারণ। সুদখোর, মহাজ্ ব্যবসায়ী ও অন্যরা স্বাধীনতা স্লোগান তুলে সামন্তবদ্যের অবসান, গ্রীজার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ব্যক্তির বাক, কর্ম ও ব্যবসার স্বাধীনতা নিশ্চিত কারী এক মতবাদ কায়েমের জন্য চেষ্টা চালাই। যার ফলে ফরাসি বিপ্লব সহ কতিপয় রাজনৈতিক বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের মূল স্লোগান ছিল 'লেইসেস ফেয়ার' অর্থাৎ "অবাধ কাজ করতে দাও ও চলতে দাও" ।

আশ্চর্যের বিষয় হলো স্বাধীনতা এই প্রবক্তারা বিজয় লাভ করার পর নিজের রাষ্ট্রের শক্তি কর্ণধার হয় বটে কিন্তু কিছু সামন্তবাদী নিজ্যাতিত আপামর জনতার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কান্ডারী হওয়ার কোন সুযোগ পাই না। পরিনামে স্বাধীনতা সুদখোর মহাজন ও পুঁজিবাদীদের সম্পদ বৃদ্ধি সহায়ক উপায়ে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্র অন্যদের জন্য নয় বরং তাদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারা নিজেদের পূর্ণজাত দ্রব্যের বাজার অন্বেষণ করে ও সস্তার কাঁচামাল প্রাপ্তি সম্ভাবনা খুঁজতে থাকে। তারাই রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীকে উপনিবেশ সৃষ্টি করতে বাধ্য করে, অতঃপর লোকদের নির্দয়ভাবে গোলামে পরিণত করে।

পুঁজিবাদী গোড়ার কথা হল, ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের মালিক সে নিজেই, এতে অন্য কারও অধিকার নে্ নিজের ইচ্ছামত সেটা ভোগ ব্যবহার করবে, এতে কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও

সামাজিক বাঁধা থাকতে পারবে না। সে নিজের ইচ্ছামত মজুদদারি গড়ে তুলতে পারবে এবং কেবল নিজের মর্জি অনুযায়ী এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে। এতে অন্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা দেখার প্রয়োজন নেই। সুদকে সে বৈধ মনে করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সুদি মহাজন ও মালিক পক্ষের সার্থ সংরক্ষণ করা এবং শ্রমিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের তেমন কিছু করার নেই, নেই কোন ধর্মীয় ও নৈতিক বাধা। তাদের স্লোগান হল "ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর জন্য এবং রাষ্ট্র হচ্ছে সবার জন্য" ।

এর ফলে ধনী আরও ধনী হতে থাকে এবং গরিব আরো গরীব হয়। শিল্পপতিরা নিজেরাই একা শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ করে। কোন সময় বিনা বেতনে, বিনা ছুটিতে ও কাজের সময় সীমা নির্ধারণ করা ছাড়াই কাজ আদায়ের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। শ্রমিকদেরকে প্রদত্ত কম বেতনে সেবা আদায় করে, ফলে তাদের রোগ ও দারিদ্র বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্বও বেড়ে যায়। এসবের ফলে সৃষ্ট ঘৃণা ও বিদ্বেষ গরিবদেরকে মুক্তির আশায় হিংসাত্মক অন্য আর এক নতুন বিপ্লব সাধন করতে উদ্বুদ্ধ করে। যার স্লোগান হলো হত্যা ও রক্তপাত এবং নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আর এই ব্যবস্থা নামে হলো কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র।

কমিউনিজম

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল কথা হল উৎপাদন, উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। ব্যাক্তি এসবের মালিক হতে পারবে না এবং নিজে ইছামত এগুলো উপভোগ ব্যবহার করতে পারবেনা। কাজের বিনিময় রাষ্ট্র থেকে তারা ভাতা লাভ করবে। সমাজের দায়িত্ব হলো নাগরিকের সুযোগ সুবিধা দেওয়া। সমাজতন্ত্রের ব্যক্তি মালিকানা ও উত্তরাধিকারের কোন অস্তিত্ব নেই। কমিউনিস্টরা ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করে ও ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বলে যে ধর্ম হচ্ছে জনগণের জন্য 'নিষিদ্ধ আকিম' স্বরূপ। এই মতবাদ শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান জানাই।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ সহ পৃথিবীতে আরও অনেক মতবাদ রয়েছে। হিটলার ও মুসোলিনের জীবন দশায় বিজয়ের মুহূর্তে এর কিছু অনুসারী থাকলেও পরবর্তীতে ইতিহাসে

বিবেচনা এ দুটি ছিল একনায়কত্ব-বাদী শাসন, যা জাতির লোকদেরকে কল্যাণ ও প্রশান্তি দান করতে সক্ষম হয়নি।

ইসলামেই রয়েছে পূর্নাংগ জীবন ব্যবস্থার শর্তাবলি

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এসব শর্তাবলী একমাত্র ইসলামই রয়েছে পূর্ণমাত্রায়। আপনি বিশ্বের সকল ধর্ম ও মতবাদ বিশ্লেষণ করে দেখুন একমাত্র ইসলামী পাবেন সবগুলো শর্ত। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (সূরা আল মায়িদা আয়াত ৩)

ইসলামের পূর্নাংগতা ও সামগ্রিকতাঃ

আপনি কুরআন ও সুন্নাহ পাঠ করে দেখুন, অবশ্যি দেখবেন একমাত্র ইসলামেই রেয়েছেঃ

১. বিশ্বাসগত পূর্ণাঙ্গতা। অদৃশ্য বিষয় সমূহের সন্তোষজনক জবাব।

২. জীবনে অখন্ডতা ধারণা।

৩. শাশ্বত নৈতিক দৃষ্টিকোণ

৪. বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনের পবিত্র মূলনীতি

৫. সামাজিক সুবিচার ও পারস্পারিক সুসম্পর্কের মূলনীতি

৬. সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক মূলনীতি

৭. অর্থনৈতিক পূর্ণাঙ্গ ও সুসম নীতিমালা

৮. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিমালা

৯.চিরন্তন হালাল ও হারামের বিবরণ

১০. উত্তরাধিকার বিধান

১১.আইন ও বিচার বিধান

১২.সমর বিধান

১৩.সত্য ও বাস্তব মানব ইতিহাস

১৪. সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য

১৫.মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ নির্দেশ

১৬.উদারনীতি অর্থাৎ চিন্তা গবেষণা ও ইসতিহাদ করার অবকাশ

১৭. উন্নয়নে নীতিমালা

১৮.দেখতে পাবেন ইসলামের বিধানসমূহ সার্বজনীন ও সর্বকালীন

১৯. দেখতে পাবেন ইসলাম রয়েছে যুগ সমস্যা সমাধান

২০. ইসলামে রয়েছে এক অদ্বিতীয় সার্বভৌম আল্লাহর বিশ্বাস

২১. ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই রয়েছে শাশ্বত মডেল মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ(সাঃ)

২২. একমাত্র ইসলামই রয়েছে নির্ভুল শাশ্বত ও অবিকৃত সোর্স অফ নলেজ অর্থাৎ আল কুরআন ও সুন্নাহ।

[রেফারেন্সঃ ইসলাম পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাঃআব্দুস শহীদ নাসিম]

১. ইসলামের অর্থ

· ইসলামের আভিধানিক অর্থ: আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, নিঃশর্ত হুকুম পালন।

· ইসলামের পারিভাষিক অর্থ হল:

- ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বিধান।

- ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবন যাপনের পদ্ধতি

- ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ।

২. ইসলাম একটি দীন একটি জীবন দর্শন

ইসলাম মূলত একটি দীন একটি জীবন দর্শন। ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি হলঃ

· তাওহিদি ইমান।

- এক আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব।
- সৃষ্টি যার বিধান তার
- পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও জীবনাদর্শ
- রাসূলের নেতৃত্ব ও মডেলের অনুসরণ
- পার্থীব সাফল্য ও পরলৌকিক সাফল্য
- শরীয়ত সৎ কাজে পুরস্কার ও অসৎ কাজে শাস্তির নিশ্চয়তা

মূলত ইসলাম একটি দীন একটি জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,
এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।(সূরা মায়িদাঃ আয়াত-৩)

৩.দীন মানে কি?

কোরআনে দীন শব্দটি ছয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলোঃ

এক. দীন মানে প্রতিদানঃ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ অর্থঃ বিচার দিবসের মালিক।(সুরা ফাতিহা আয়াত ৪)

দুই. দীন মানে –আইনঃ আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের দুজনের প্রতি যেনো তোমাদের দয়া না হয়।(সুরা ২৪ঃআয়াত ২)

তিন. দীন মানে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা

وَ قَالَ فِرۡعَوۡنُ ذَرُوۡنِیۡۤ اَقۡتُلۡ مُوۡسٰی وَ لۡیَدۡعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اَنۡ یُّبَدِّلَ دِیۡنَكُمۡ اَوۡ اَنۡ یُّظۡهِرَ فِی الۡاَرۡضِ الۡفَسَادَ অর্থঃ আর ফির ‘আউন বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের দীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে। (সূরা ৪০ আয়াত ২৬)

চার. দীন মানে ধর্ম ও নৈতিকতা

আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। (সূরা বাকারা আয়াত ২১৭)

পাচ. দীন মানে আনুগত্য

وَ مَآ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَ یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ

আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন। (সুরা আল বায়্যিনাহ আয়াত ৫)

ছয়. দীন মানে জীবন যাপন

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। (সূরা আ মায়িদা আয়াত ৩)

ধর্মের নামকরনে সার্বজনীনতাঃ

যা খাটি ধর্ম তার নামটা হবে একটা যুক্তিসঙ্গত নাম। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই পৃথিবীতে মোট যত ধর্ম আছে তার প্রত্যেকটির নামই সেই ধর্মে প্রবর্তকের বা কোন স্থানের নামানুসারে। যেমন যিশু খ্রীষ্টের নাম অনুসারে খ্রিস্টান ধর্ম, মহ্াবীর জৈনের নাম অনুসারে জৈন ধর্ম, গৌতম বুদ্ধের নাম অনুসারে বৌদ্ধ ধর্ম, হেন্দের নাম অনুসারে হিন্দু ধর্ম, কিন্তু ইসলাম ধর্মের নাম কোন ব্যক্তির নামানুসারে নয়।

যদি এ ধর্মের নাম মুহাম্মদী ধর্ম হত তাহলে অন্য ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকতো না। কিন্তু এ ধর্মের নাম এমনই একটি সার্বজনীন শব্দ দ্বারা রাখা হয়েছে যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কারণ মানব জীবনের মৌলিক আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে জীবন নিয়ে শান্তি লাভ করা আর ইসলাম মানেও শান্তি। তাহলে প্রমাণিত হলো মানব জীবনের যে নিয়ম নীতি মেনে চললে জীবনের শান্তি লাভ হতে পারে সেই নিয়ম নীতি মানব ধর্ম হওয়া উচিত এবং তার নামটাও ‘শান্তিপূর্ণ ও আত্মসমর্পণ করা’ হওয়া যুক্তিযুক্ত। তাহলে মানব জীবনের শান্তির জন্য যেসব নিয়ম নীতি নবী রাসূলগণের মাধ্যমে দান করেছেন সেই সব নিয়ম নীতির নাম আল্লাহ রেখে দিলেন ইসলাম বা শান্তি। ইসলাম কোন বিশেষ গোষ্ঠীর

জন্য নয় বরং কোটা মানবজাতির ধর্ম তাই তার নামটা যেন সার্বজনীন ধর্মটা তেমন সর্বকালীন ও সর্বজনীন।

ইসলামিক জীবন ব্যবস্থা সোর্স অব নলেজ

ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার রয়েছে শাশত সোর্স অব নলেজ। তা হল আল কোরআন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ۬ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰی صِرَاطِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ

এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে। (সুরা ১৪ আয়াত ১)

এছাড়া ইসলাম যুগ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদ করাকে গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম সর্বকালের আধুনিক ও গতিশীল।

আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

একদিকে যেমন ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম একখানা পূর্ণ ধর্ম গ্রন্থ দিতে পারে না। তেমন কুরআনে এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে এটা নাযিল হয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে আর সত্যতা প্রমাণ হচ্ছে আজ এই একঅংশ শতাব্দীতে। এই কোরআনের এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই। যেমনঃ ১.কুরআনের ভাব ভাষা এমন ভাবে সুবিন্যস্ত যার অনুরূপ একটি সূরা আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি।

২. যার উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক তথ্য গুলি বা কোন কথা কেউ আজ পর্যন্ত কেউ অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করতে পারেনি।

৩. পৃথিবীর সব ধরনের ধর্মগ্রন্থ যদি পুড়িয়ে দেওয়া হয় তবে নতুন করে হাফেজ এর মাধ্যমে কোরআন পুনরাবৃত্ত করার সম্ভব। এছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পুনাবৃত্ত করা সম্ভব নয়।

৪. সুসাহিতিক আবু ওসমান আল জাহিস বলেন, আল কুরআন নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রম্াণ আস্তিকদের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা, হালাল এর প্রতিষ্ঠাত্ হারামের উচ্ছেদ কারী এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। কুরআন এমন এক বিচারক যে জ্ঞানী মূর্খ সবাই যার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এমন জ্ঞান যার ধ্বংস নেই। এমন মুর্শিদ যে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে থাকে।

৫. মিস্টার ভোগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, কুরআন একটি চিরন্তন আদর্শ দীর্ঘ ১৩০০ বছর পরও কোরআনের শিক্ষার প্রভাব এত বেশি শক্তিশালী যে, নিজ বংশের একজন নগণ্য লোকও ইসলাম গ্রহণ করার পর বড় বড় খানদানি মুসলমানের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

৬. জি,এম, আর রাডউইন তার 'দি কুরআন' গ্রন্থ লিখেছেনঃ আল কুরআন জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার উৎস। এ কথা মানতে হবে যে, আল্লাহর একত্ববাদ, শক্তি, জ্ঞান এবং সভ্যতার যে বর্ণনা।

ইসলামে নবী মুহাম্মদ(সা.)

১.আমাদের নবি(সাঃ) এর নবুয়াত বিশেষ কোন দেশ বা গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র জাহানের সকল জাতির জন্য নবি।

وَ مَآ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا وَّ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

আমি তোমাকে সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা ৩৪ আয়াত ২৮)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

বলে দাও, হে মানব মন্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর তাঁর

প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।(সূরা ৭ আয়াত ১৫৮)

২.আমাদের নবী সকল নবীর চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তিনি নবি রাসুলদের সর্দার এবং সর্বশেষ নবি। কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কেয়াস স্বারা এটা প্রমানিত।

এক. এ কারনেই আল্লাহ সব নবি-রাসুল থেকে আমাদের নবী(সাঃ) এর যুগ পাওয়ার শর্তে তার প্রতি ইমান আনয়ন ও তার নুসরত করার অঙ্গীকার গ্রহন করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এটা বর্নিত হয়েছেঃ

وَ اِذْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

"আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছেন- আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল তোমাদের কাছে আসবে- তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ' ? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম' । আল্লাহ বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম" । (সুরা ইমরান আয়াত ৮১)

দুই. তার উম্মতকে সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়ছে। আর উম্মমত শ্রেষ্ঠ হয় দীনী কামালিয়াতের ভিত্তিতে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক। ((সুরা ইমরান আয়াত ১১০)

তিন. হাদিসে এসেছেঃ অন্যান্য নবিদের উপর ছয়টি বিষয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। (তার মধ্যে একটি হল আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি)

চার. রাসুল(সাঃ) এর শরী' আতের চেয়ে কামেল ও পুঙ্গনাঙ্গ। আর শরীয়াত পুর্নাঙ্গ ও কামেল হওয়া নবুওওয়াত কামেল হওয়ার প্রমান বহন করে।

৪. তিনি খাতামুন্নাবীয়্যীন অর্থাৎ শেষ নবি। তার পরে কোন নবি আসবেন না। অন্য কেউ নবি হিসেবে দাবি করলে সে ভন্ড এবং কাফের।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَ لٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِيۡمًا

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।* আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।(সূরা আহযাব আয়াত-৪০)

রাসূল(সাঃ) সত্য নবী ছিলেন তার প্রমান

রাসুল(সাঃ) যে সত্য নবি ছিলেন উলামায়ে কেরাম কুরাআন হাদীছ থেকে, বাস্তব ঘটনা থেকে এর প্রমান তিন হাজারের মত সংগ্রহ করেছেন। এ বিষয়ের উপর অনেক কিতাবও লিখা হয়েছে।

এই প্রমানগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

১. রাসূল (সাঃ) যে সত্য নবী ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআন। একজন উম্মি মানুষ হওয়া সত্বেও নবী এর মুখ থেকে কুরআনের ন্যায় এরূপ মহা জ্ঞান ভান্ডারের গ্রন্থ প্রকাশ পাওয়াই প্রমাণ করে যে তিনি মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসব জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ আলামিন চ্যালেঞ্জও পেশ করেছেন। ইরশাদ করেছেনঃ

وَ اِنۡ كُنۡتُمۡ فِیۡ رَیۡبٍ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلٰی عَبۡدِنَا فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَۃٍ مِّنۡ مِّثۡلِهٖ ۪ وَ ادۡعُوۡا شُهَدَآءَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ

আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সুরা বাকারা আয়াত-২৩)

২. নবী(সাঃ) এর দ্বারা বহু সংখ্যক মু' জিজা প্রকাশ পাওয়া।

৩. নবী(সাঃ) এর সত্য হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হল তার মহরে নবুওয়াত। নবী এর পিছে মোহর নবুওয়াত বা নবুয়তের সীলমোহর ছিল। অর্থাৎ তার পিঠে বিশেষ একটা চিহ্ন ছিল। এটা ছিল একটি উঁচু কালো একটা মাংসপিণ্ড।সাহাবারাও এটা দেখেছেন। আগে যুগের কিতাবে সম্বন্ধে বর্ণনা ছিল।

৪. নবী(সাঃ) এর সত্য হওয়ার আরেকটি বড় প্রমাণ হলো সেই যুগের কাফেরার, সেই যুগের ঘোর শত্রুরাও রাসূলকে মিথ্যুক বলতে পারেনি। মুসলমান, অমুসলমান, শত্রু, বন্ধু নির্বিশেষে সকলেই তাকে ‘আলামিন’ বলে ডাকতো। অর্থাৎ সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী। তিনি যখন নবুওয়াতের দাবি করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী প্রাপ্ত হওয়ার দাবি করেছেন তখনও তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি বরং তাকে সত্যবাদী মনে করেছে।

৫. আরও একটা বড় প্রমাণ হল আগের যুগের আসমানী কিতাবসমূহের বর্ণনা। রাসুলের যুগে আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিল বিশেষভাবে দুইটি দল। একটা দল হল ইয়াহুদী আর এটা দল হলো নাসারা বা খ্রিস্ট… ইহাদীদের কিতাব হল তাওরাত আর নাসারা বা খ্রিস্টানদের কিতাব হল ইঞ্জিল। এই তাওরাত এবং ইঞ্জিলে পরিষ্কারভাবে রাসুলের আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ ছিল। এমনকি তার দেহের গঠন কেমন হবে, তার চোখ কেমন হবে, তার চুল কেমন হবে, কোন অবস্থায় তিনি আবির্ভূত হবেন, কোন এলাকায় তিনি আবির্ভূত হবেন, কখন কখন তিনি সফর যাবেন এসব অবস্থা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা ছিল। আগে যুগের ঐতিহাসিকরা তাওরাত এবং ইঞ্জিল থেকে এরকম বহু উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দেখেছেন যে শেষ নবীর আগমন এবং তাঁর গুনাব গুন ইত্যাদি সম্পর্কে কত পরিষ্কার বর্ণনা এসব কিতাবে ছিল। নিম্নে এরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি পেস করা হলো।

বাইবেল থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ইঞ্জিলে যেসব প্রমাণ পাওয়া যায়, নিম্নে তার কয়েকটি উদ্ধৃতি পেস করা হলোঃ

যিশুখ্রিস্টের সম সময়ে সাধু যোহন আবির্ভূত হয়েছিলেন। জেরুজালেম থেকে ইহুদীরা কতিপয় পাদ্রিকে তার পরিচয় নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। তারা এসে যখন যোহকে যে কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং যহন তার যে উত্তর দেন তাতেই হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) এর আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়। বাইবেলে এরূপ উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ "জোহন সম্বন্ধে এরূপ গৃহীত হয়েছে যে যখন জেরুজালেম থেকে ইহুদীদের দ্বারা প্রেরিত পাদ্রী এসে যহনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি কে? তখন যহন স্বীকার করলেন আমি যীশু খ্রীষ্ট নই। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বলেন আমি ইলিয়াস নই। আপনি তবে কি সেই নবী? যহন উত্তর দিলেন না। তখন তারা আবার জিজ্ঞাসা করলেন যদি আপনি যীশুখ্রীষ্ট, ইলিয়াস অথবা সেই নবী না হন তবে কেন বাপ্তাইজ করেছেন? যহন উত্তর দি্লেন আমি পানি দ্বারা বাপ্তাইজ করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছে যাকে তোমরা জানো না। তিনি সেই জন যিনি আমার পরে এসো আমার অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হবে এবং আমি যার জুতোর ফিতা খুলবার যোগ্য নই" ।

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে যীশুখ্রীষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়া তৃতীয় আর একজন নবীর যে আসবেন সে কথা ইহুদীরা জানতো। উদ্ধৃতি গুলো কবি গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবী গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

এই 'সেই নবী' যে একমাত্র হযরত মুহাম্মদই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কারণ যীশু খ্রীষ্টের পরবর্তী পয়গম্বর ই হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ(সাঃ)। যীশু খ্রীষ্ট নিজেও বলেছেনঃ

"যদি তোমরা আমাকে ভালোবাসো তবে আমার উপদেশ মত কারো কার্জ কর, আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব যাতে তিনি তোমাদেরকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন- যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন" । (জোহন ১৪:১৫-১৬)

তিনি আরও বলছেনঃ "যা হোক আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমের চলে যায়, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাকে পাঠিয়ে দেবো। (জোহন ১৭:৭-৮)

অন্যত্র আছে, "যা হোক যখন সেই সত্য আত্মা আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সর্বপ্রকার সত্য পথে চালিত করবেন, কারণ তিনি নিজে কথা কিছু বলবেন না। কিন্তু যা তিনি শুনবেন, তাই বলবেন এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা দেখাবেন" । (জোহন ১৩:১৩-১৬)

এই "শান্তিদাতা" কে? হযরত মুহাম্মদই কেই কি স্পষ্ট করে এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে না? যীশু খ্রীষ্টের পর একমাত্র হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) ছাড়া অন্য কোন পয়গম্বর আবর্তিত হননি। তাছাড়া শব্দের অর্থ শান্তি দাতা অথবা চরম প্রশংসিত। এ দুটি বিশেষণ ই হযরত মুহাম্মদের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ-সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাওরাত থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

ইহুদিদের ধর্ম শাস্ত্রে "তাওরাত" -এ হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যৎবাণী আছে। কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "বিশ্বনবী" থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছিঃ

"তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভাতৃদিগের মধ্যে হতে আমার মতই একজন পয়গম্বর উত্থাপিত করবেন। তার কথা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে" । (ডিউটরোনমি ১৫;১৮)

অন্যত্র আছেঃ

"(ঈশ্বর বলেছেন) আমি তোমাদের ভাতৃদিগের মধ্যে হতে তোমার মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করব এবং তার মুখে আমার বাণী প্রকাশ করব। তিনি তোমাদেরকে আমি যা আদেশ করবো তা-ই শুনাবেন এবং এটা অবশ্য ঘটবে যে তার মুখ নিশ্চিত আমার সে বাণী যারা শুনবে না তাদেরকে আমি শুনতে বাধ্য করব"।(ডিউটরনমি ১৮;১৮-১৯)

আরো একটি দৃষ্টান্ত দেখুনঃ

"এবং ইশ্বর মনোনীত পুরুষ মুসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলে বনি ইসরাঈলদেরকে আশীর্বাদ করলেন এবং তিনি বললেন প্রভু সিনাই পর্বত হতে আসলেন এবং স্যিের পর্বত হতে

উঠলেন, কিন্তু তার জ্যোতি ফারেন পর্বত হতে বিকির্ন হল; তিনি দশ হাজারর ভক্ত সঙ্গে আনলেন এবং তিনি দক্ষিণ হস্ত হতে এক জীবন্ত আইনগ্রস্ত বের হলো" ।(ডিউটরনমি ৩৩;১-২)

এ সমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তা স্বীকার করবেন।

উল্লেখ্য এখন যে তাওরাত ইঞ্জিল অর্থাৎ এখন যে বাইবেল পাওয়া যায় তাতে সেসব বর্ণনা পাওয়া যায় না। কারণ বর্তমান তাওরাত্-ইঞ্জিল বিকৃত তাওরাত ইঞ্জিল। প্রকৃত তাওরাত এবং ইঞ্জিলের বহু স্থানে মোহাম্মদ এর আগমনে সুসংবাদ ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইহুদি খ্রিস্টান পন্ডিতরা সে সম্বন্ধে ভালোভাবে অবগত ছিল। এর বহু প্রমাণ আছে যথাঃ

তখন মদিনায় বনু কুরাইজা এবং বনু নাজির নামক দুটো ইহুদি গোত্র বাস করত। ওই এলাকার অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের সবসময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। সেসব যুদ্ধে ইহুদীরা পরাজিত হলে তারা বলতো শেষ জামানার নবী এই এলাকার হিজরত করতে আসবেন, আমরা তাকে চিনতে পারব, তোমরা তাকে চিনতে পারবে না। কারণ তার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিতাবে বর্ণনা আছে। যার ফলে তাকে আমরা চিনতে পারবো এবং তাকে চিনে আমরা তার অনুসারী হয়ে যাব এবং তার সঙ্গে মিলে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমাদের পরাজিত করব। আল্লাহ কুরআন শরীফ এটা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

وَ لَمَّا جَآءَهُمۡ کِتٰبٌ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمۡ ۙ وَ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ یَسۡتَفۡتِحُوۡنَ عَلَی الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا ۚۖ فَلَمَّا جَآءَهُمۡ مَّا عَرَفُوۡا كَفَرُوۡا بِهٖ ۫ فَلَعۡنَۃُ اللّٰهِ عَلَی الۡكٰفِرِیۡنَ

আর যখন তাদের কাছে, তাদের সাথে যা আছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সত্যায়নকারী কিতাব এল, অথচ তারা পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট এল যা তারা চিনত, তখন তারা তা অস্বীকার করল। অতএব কাফিরদের উপর আল্লাহর লা 'নত।(সূরা বাকারা-৮৯)

নিজেদের হীন স্বার্থ রক্ষার জন্যই তাদের এমন অস্বীকার করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ভেবেছিল এখন আমরা এ নবীর অনুসারী হলে আমাদের নেতৃত্ব আর থাকবে না।

বৌদ্ধশাস্ত্রেঃ

বৌদ্ধদিগের প্রামান্য গ্রন্থ ‘দীঘা নিকায়া’ এ উল্লিখিত হয়েছেঃ “মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন, তার নাম ‘মৈত্তেয়’ অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ” ।

আমরা নিম্ন সিংহল হতে প্রাপ্ত একটি প্রমাণের উল্লেখ করছি। তাতেও উপরোক্ত কথা সমর্থন আছেঃ

আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার মৃত্যুর পর কে আমার দিকে উপদেশ দিবে? বুদ্ধ বললেনঃ আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসবেন- আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত--- তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম মত প্রচার করবেন।

আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন, তাকে আমরা চিনব কি করে?

বুদ্ধ বললেনঃ তা নাম হবে ‘মৈত্রেয়’ ।

এই ‘শান্তি ও করুণার বুদ্ধ’ যে মোহাম্মদ (সাঃ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোরআন শরীফে মুহাম্মদ (সাঃ এর বিশেষণও অবিকল এরূপই আছে। মোহাম্মদ (সাঃ সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ তিনি ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য মুর্ত করুনা ও আশীর্বাদ।

বেদসমূহে মোহাম্মদ (সাঃ এর উল্লেখঃ

হিন্দু ধর্মের সর্বাধিক পরিচিত ও সর্বপ্রথম ধর্মীয় গ্রন্থ হল বেদ আর বেদ হল চারটিঃ ঋকবেদ, যজর্বেদ, সমবেদ ও অথর্বেদে।বেদ চতুর্বেদে মোহাম্মদের বর্ণনা রয়েছে। তার মধ্যে অথর্ব বেধে বিস্তারিত। এখন শুধু নমুনা স্বরূপ উক্ত বেদের মধ্যে কিছু উপস্থাপনা করা হলোঃ

১. অর্থ্ব বেদের ২০ তম কান্ড, নবম অনুবাক একত্রিশসূত্র ৪৭২ পৃষ্ঠার প্রথম মন্ত্রের রয়েছেঃ

“ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে। ষষ্টিং সহস্রানতিংচ কৌরম আ রুস্মেষু দন্মহে ”

অর্থাৎঃ হে মানব মন্ডলী! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর!”নরাশঙ্স” এর প্রশংসা করা হবে। আমি এই মহাজীর বা প্রশান্তির ঝান্ডাবাহীকে ষাট হাজার শত্রুর মাঝে সুরক্ষিত

রাখবো। এখানে নরাশঙ্গ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ যা মূলত দুটি শব্দ মিলে গঠিত। “নর” যার অর্থ মানুষ আর “আশঙ্গ” যার অর্থ হল এমন ব্যক্তি যার বেশি বেশি প্রশংসা করা হয়। সুতরাং “নরসা” ঙ্গ এর হুবহু আরবি শব্দ “মোহাম্মদ” । শব্দ দু’ টির মধ্যে পার্থক্য এই যে “নরাশাঙ্গ” সংস্কৃত আর মোহাম্মদ আরবি শব্দ।

এই মন্ত্রে দ্বিতীয় পংক্তিতে “নরাশঙ্গ” কে “কৌ্রাম” বলা হয়েছে। কৌরাম শব্দের দুটি অর্থ, প্রথমঃ মহাজীর বা জন্মভূমি ত্যাগকারী। দ্বিতীয় শান্তির ও নিরাপত্তার পতাকা বাহী। এ দুটি অর্থই আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাম এর ব্যাপারে সর্বাধিক প্রযোজ্য। কারণ তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন এবং তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার পতাকাবাহী ছিলেন যা ইতিহাস পড়ে যে কোন ছাত্র জানেন।

২.উক্ত বেদের সপ্তম মন্ত্রে রয়েছেঃ

অর্থাৎ তিনি তো পৃথিবীর সম্রাট ও দেবতা, সর্বোত্তম মানুষ, সমস্ত মানবতার দিশার্ সকল জাতির নিকট সুপরিচিত, তার সর্বোচ্চ প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা কর।

এই মন্ত্রটি ও মোহাম্মদ(সাঃ) এর বিশেষ কিছু গুণাবলী সংশ্লিষ্ট যা পৃথিবীর কোন মহাপুরুষের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

অথর্ববেদের ২০ তম কান্ডের নবম অনুবাদক, ৩১ তম সুক্তের ১৪ মন্ত্রের প্রথম ও সপ্তম মন্ত্র থেকে কিঞ্চিত উল্লেখ করা হলো। উক্ত বেদের অবশিষ্ট 12 মন্ত্রে ও ঋক বেদে নবী মুহাম্মদ(সাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। জানার জন্য আগ্রহী পাঠককে অথর্ববেদের ৪৭২ পৃষ্ঠা থেকে ৪৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ার পরামর্শ রইল।

উল্লেখিত পৃষ্ঠাসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলোঃ

১.মোহাম্মদকে “রবিহ” বলা হয়েছে যার আরবি হুবহু শব্দ “আহমদ” অর্থাৎ অতি প্রশংসাকারী। যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

২.তিনি অতি সুদর্শন হবেন। আর ইহা তার জীবন চরিত্র সবাই উল্লেখ করেছেন।

৩.মহাপথ প্রদর্শক, পূত-পবিত্র, বার্তাবাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং পৃথিবীর সর্দার ও নেতা হবেন। তার পয়গাম্বারী মানবতার জন্য।

৪.মানুষদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন।

৫.মহান আল্লাহ তাকে অদৃশ্যের খবর জানিয়ে দেবেন এবং তিনি তা মানুষদেরকে বলে দেবেন।

৬.তার বাহন ভাবে উট আর নিঃসন্দেহে তার বাহন ছিলো উট এতে কারো দ্বিমত নেই।

৭.তার 12 জন স্ত্রী হবে। নবী-রাসূলগণ, ঋষি ও পুরোহিত্যের মধ্যে একমাত্র তারই ১২জন স্ত্রী ছিল।

৮.তিনি নাস্তিক, জালেম ও পাপীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন আর ইহা তার জীবনে ঘটেছে।

৯.তার সাথীগন অতি প্রশংসাকারী ও নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী হবেন। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থাতেও এ নজির মোহাম্মদ(সাঃ) এর সাথীগণ ব্যতীত আর কারো মধ্যে পাওয়া যায়নি।

১০.তার সাথীদের দারা-পরিবার যুদ্ধ অবস্থায় নিরাপদে থাকবে। ইহা বাস্তবে ঘটেওঠছে।

১১.কাবা ঘর নির্মাণের সময় তার বড় কৌশল প্রকাশ পাবে, যার ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনগণ দারুন আনন্দিত হবে। ইহা তার জীবনে ঘটেছিল যার প্রমাণ ইসলামী ইতিহাস।

১২.সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করবেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হবার ফলে সকলে খুশি হবেন।

১৩.তিনি অনাথের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, হাজার হাজার মানুষকে দান-খয়রাত করবেন এবং তার যুগে লোকেরা সবাই শান্তি লাভ করবে।

খ)পুরানে মোহাম্মদ(সাঃ)-এর পূর্বাভাসঃ

"পুরান" হিন্দু ধর্মের এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পুরান মোট ১৮টি বলা হয়। তার মধ্যে "ভুসিয়া পুরাণ" অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পুরাণ। পুরানে "কল্কি অবতার" (বার্তা বাহক) আগমনের পূর্বাভাস স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর তাওহীদ প্রসঙ্গে ইসলাম

কুরআনের পুর্নাঙ্গ বিশ্লেষনের মাধ্যমে জানা যায় যে, তাওহীদ তথা একত্ববাদ তিন অংশে বিভক্তঃ

প্রথম প্রকারঃ রুবুবিয়াত(সৃস্ট, সার্বোভৌম প্রভুত্বো পরিচালন) – এর ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহীদঃ

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবু তারা কীভাবে বিমুখ হয়? (সূরা যুখরুফ-৮৭)

তিনি আরও বলেনঃ

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

বল, 'আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিযক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন' ? তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ' । সুতরাং, তুমি বল, 'তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না' ? - (সুরা ইউনুসঃ ৩১) ; আর অনুরূপ আর ও অনেক আয়াত রয়েছে ।

আর এই প্রকার তাওহীদকে ফেরাউন অহঙ্কার ও গোড়ামিবশত অস্বিকার করেছে ; যেমন তার কথাঃ

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۳

ফিরআউন বলল, সৃষ্টিকুলের রব আবার কী? (সুরা আশ- শু" আরাঃ ২৩) তার অস্বিকার করা যে অহঙ্কারবশত ও ইচ্ছাকৃত , তার প্রমানে আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেনঃ

মূসা বলেছিলঃ তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। - (সুরা আল- ইসরাঃ ১০২)

তিনি আরো বলেন

وَ جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا ؕ

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। - (সুরা আন নামল ঃ ১৪)

আর এই কারনে তাওহীদের এই প্রকারকে সাব্যস্ত করার জন্য স্থিরকরনসুচক প্রশ্নবোধক (استفهام التقرير)

শব্দ দ্বারা আল কুরআন অবতীর্ন হতো , যেমন তার বানীঃ

ۘ اَفِی اللّٰہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ

আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? (সুরা ইবরাহিমঃ ১০) তিনি আর ও বলেনঃ

ۘ اَغَیۡرَ اللّٰہِ اَبۡغِیۡ رَبًّا وَّ ہُوَ رَبُّ کُلِّ شَیۡءٍ ؕ

বল, 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রব অনুসন্ধান করব' অথচ তিনি সব কিছুর রব ' ? – (সুরা আল আন" আমঃ ১৬৪) তিনি আর ও বলেন

ۘ قُلۡ مَنۡ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ قُلِ اللّٰہُ

বল, 'আসমানসমূহ ও যমীনের রব কে' ? বল, 'আল্লাহ' । (সুরা আর-রাদঃ ১৬) এবং অনুরুপ আর আয়াত । কারন, তারা এর স্বীকৃতি প্রদান করে ।

আর প্রকারের তাওহীদ তথা একত্ববাদ কাফির সম্প্রদায়ের কোন উপকার করে নি; কারন, তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে গ্রহন করেনি ; যেমন তিনি বলেছেনঃ

﴾وَ مَا یُؤۡمِنُ اَکۡثَرُہُمۡ بِاللّٰہِ اِلَّا وَ ہُمۡ مُّشۡرِکُوۡنَ ﴿۱۰۶

তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। - (সুরা ইউসুফঃ ১০৬) ; তিনি আরো বলেছেনঃ

ۘ مَا نَعۡبُدُہُمۡ اِلَّا لِیُقَرِّبُوۡنَاۤ اِلَی اللّٰہِ زُلۡفٰی

আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দিবে । " _ (সুরা যুমার:3) তিনি আর ও বলেছেনঃ

ۘ وَ یَقُوۡلُوۡنَ ہٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنۡدَ اللّٰہِ ؕ قُلۡ اَتُنَبِّـُٔوۡنَ اللّٰہَ بِمَا لَا یَعۡلَمُ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی الۡاَرۡضِ

আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী' । বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন ' ? – (সুরা ইউনুসঃ ১৮)

দ্বিতীয় প্রকারঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহীদঃ

এটা এমন একটি বিষয় যাকে কেন্দ্র করেই রাসূলগন ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে ; আর এটা এমন একটি ব্যাপার , যা বাস্তবায়ন করার জন্যই নবী ও রাসুলদের প্রেরন করা হয়েছে । আর তার মূলকথা হলঃ لا إله الا الله) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই – এর অর্থ । সুতরাং তা দূটি মুলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ নীতি দুটি হলো

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই – এর মধ্যকার নেতিবাচক দিন ও ইতিবাচক দিক।

বাক্যটির নেতিবাচক অর্থ হলঃ সকল প্রকারের ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সকল প্রকার উপাস্যকে পরিহার বা প্রত্যাহার করে নেয়া ।

বাক্যটিতে ইতিবাচক অর্থ হলঃ সকল প্রকার ইবাদত তার বিধিবদ্ধ শর" য়ী পদ্ধতিতে এককভাবে ও একমাত্র তারই জন্য নির্দিষ্ট করা । আল-কুরআনের সিংহভাগ আয়াতই এই প্রকার তাওহীদ প্রসঙ্গে ; যেমন

ۚ وَ لَقَدۡ بَعَثۡنَا فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ وَ اجۡتَنِبُوا الطَّاغُوۡتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; - (সুরা আন-নাহলঃ ৩৬)

﴿وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِیۡۤ اِلَیۡہِ اَنَّہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ ﴿۲۵

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।' - (সুরা আল-আম্বিয়াঃ ২৫)

ۚ فَمَنۡ یَّکۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَ یُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰہِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَکَ بِالۡعُرۡوَۃِ الۡوُثۡقٰی * لَا انۡفِصَامَ لَہَا

অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। - (সুরা আল বাকারাহঃ ২৫৬)

﴿وَ سۡـَٔلۡ مَنۡ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ مِنۡ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلۡنَا مِنۡ دُوۡنِ الرَّحۡمٰنِ اٰلِـہَۃً یُّعۡبَدُوۡنَ ﴿۴۵

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? - (সুরা যুখ্রুফঃ৪৫)

﴿قُلۡ اِنَّمَا یُوۡحٰۤی اِلَیَّ اَنَّمَاۤ اِلٰـهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿۱۰۸

বল, ‘আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে’ ? -- (সুরা আল-আম্বিয়াঃ ১০৮) ; আর এই প্রসঙ্গে আর ও বহু আয়াত রয়েছে ।

তৃতীয় প্রকারঃ স্বীয় নাম ও গুনাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহীদঃ

আর এই প্রকারের তাওহীদ দু” টি মুলনীতির উপর প্রতিষ্টিত , যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বর্ননা করেছেনঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির গুনাবলির সাথে তুলনা করা থেকে পবিত্র রাখা ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তায়ালা নিজেকে অথবা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যেমন গুণে গুণান্বিত করেছেন , রূপকার্থে নয় বরং প্রকৃতার্থে আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্নতা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলোর প্রতি ইমান আনা । আর এটা জানা কথা যে , আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ চাইতে জ্ঞানী কেউ নেই যে আল্লাহর গুন বর্ননা করতে পারে , আর আল্লাহর পরে আল্লাহর গুনাবলি সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের চাইতে অধিক জ্ঞানী কেউ নেই যে তার গুনাবলি বর্ননা করতে সক্ষম ।

আর আল্লাহ তায়ালা নিজের ব্যাপারে বলছেনঃ

ءَاَنۡتُمۡ اَعۡلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ

‘ তোমরাই বেশী জান নাকি আল্লাহ’ ? – (সুরা আল-বাকারাহঃ ১৪০)

আর তিনি তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَ مَا یَنۡطِقُ عَنِ الۡهَوٰی ؕ﴿۳﴾اِنۡ هُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی ۙ﴿۴

আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না।তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়, - (সুরা আন নাজমঃ ৩ -৪)

আল্লাহ তায়ালা তার বানী দ্বারাই তার অনুরূপ কোন কিছু নেই বলে বর্ননা করেছেন ; তিনি বলেন;

ۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهٖ شَیۡءٌ

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, - (সুরা আশ-শুরাঃ ১১) আর তিনি তার ইতিবাচক গুনাবলীসমূহ প্রকৃতার্থেই সাব্যস্ত করেছেন তার ভাষায়ঃ

﴿وَ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ﴾ ١١

আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা । - (সুরা আশ-শুরাঃ ১১) ; সুতরাং আয়াতের প্রথামাংশ দ্বারা প্রমানিত যে , তার গুনাবলী অকার্যকর বা অসার করার অবকাশ নেই ।

তাই আয়াত থেকে সুস্পস্ট যে , প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো কোন প্রকার সাদৃশ্যস্থাপন ছাড়া প্রকৃত অর্থেই তার গুনাবলি তার জন্য সাব্যস্ত করা এবং তার গুনাবলী অকার্যকর না করে অন্য সব কিছুর সাথে তার সাদৃশ্যতাকে অস্বিকার করা ।

তিনি সৃষ্টি কর্তৃক তাকে বেষ্টন করার অক্ষমতার কথা সুস্পস্টভাবে বর্ননা করে দিয়েছেন ; তিনি বলেছেনঃ

﴿یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِهٖ عِلۡمًا﴾ ١١٠

তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। - (সুরা ত্বহাঃ ১১০)

উপদেশ প্রসঙ্গে ইসলামঃ

সকল বিজ্ঞজন একমত পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে পৃথিবীতে 'পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান তথা বিদ্যার ' উপদেশের চেয়ে বড় কোন উপদেষ্টা ও ধমকদাতা প্রেরণ করেননি। আর তা হচ্ছে এই যে, মানুষ এ- কথা খেয়াল রাখবে যে তার সম্মানিত ও মহান প্রতিপালক তাকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সে যা কিছু গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি সে সম্পর্কে জানেন।

আলেমগণ এই বড় উপদেষ্টা ও মহা ধমকদাতার জন্য এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যার দ্বারা বোধগম্য জিনিস অনুভবযোগ্য জিনিসের মতো হয়ে যায়। তারা বলেন: যদি আমরা একজন বাদশাহকে ধরে নিই, যে বাদশাহ্ অত্যাধিক রক্তপাতকারী, মানুষ হত্যাকারী ও প্রচন্ড আক্রমণকারী ও শাস্তিদাতা, আর তার জল্লাদ তার মাথার উপরে দাড়ানো এবং চামড়ার বিছানা বিছানো, তরবারীটি থেকে রক্ত ঝরছে এবং ঐ বাদশাহ্ র চারপাশে তার

কন্যা ও স্ত্রীগণ ; এমন ভয়ংকর অবস্থায় বাদশাহের চোখের সামনে ও তার উপস্থিতিতে উপস্থিত কোন দর্শক কি ঐ বাদশার কন্যা ও স্ত্রীগণের নিকট থেকে অবৈধ কিছু অর্জনের চিন্তা করবে? না, কখনো ও না! (আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে যাবতীয় মহত্তম বরং তখন প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি হবে ভীত সন্ত্রস্ত, তাদের হৃদয়সমূহ হবে অবনত, তাদের চক্ষুসমূহ হবে আতঙ্কগ্রস্ত, তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো হবে হিম শীতল, তাদের চূড়ান্ত আশা হবে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, (আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে মহত্তম দৃষ্টান্ত) আল্লাহ তা'আলা হলেন মহাজ্ঞানী, ঐ বাদশার চেয়েও অধিক ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ; সন্দেহ নেই যে তিনি মহান শাস্তিদাতা, প্রচন্ড শক্তিশালী ও কঠিন শাস্তিদাতা। তার জমিনে তার সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তার নিষেধসমূহ।

এমনিভাবে কোন শহরবাসী জানে যে, শহরের আমীর বা শাসক তারা রাতের বেলায় যেসব কাজ করে তার সবকিছুই জানতে পারেন। তবে তারা আতঙ্কিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করবে এবং তার ভয়ে তারা সকল প্রকার অন্যায় ও অপকর্ম ত্যাগ করবে।

আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে যে হেকমত বা রহস্যের কারণে সৃষ্টি করেছেন। তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন ; তা হলো তাদেরকে পরিক্ষা নিরীক্ষা ও যাচাই বাছাই করা। যেমন তিনি বলেছেন :

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧

নিশ্চয় যমীনের উপর যা কিছু আছে আমরা সেগুলোকে তার শোভা করেছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ। (সূরা আল কাহাফ : ৭) তিনি সূরা হুদের প্রথম দিকে বলেন :

وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য। (সূরা হুদ : ০৭) ; তিনি বলেননি : তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি আমলকারী।

তিনি সূরা মুলকের মধ্যে বলেন,

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ﴿۲

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য–কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পর্যক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা মুলক : ০২)

এই আয়াত দুটি তার নিম্নোক্ত বানীর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করে। যেমন তিনি বলেন :

﴿وَ مَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَ الۡاِنۡسَ اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡنِ ﴿۵۶

আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে। (সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬)

যেহেতু সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার হেকমত তথা রহস্য হলো উল্লিখিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করা, সেহেতু জিবরাইল আ: মানুষের জন্য এই পরিক্ষা সফলকাম হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করে দিতে চাইলেন, তাই তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: আপনি আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলে দিন? তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট করেন যে, এখানে আলোচিত এই শ্রেষ্ঠ ধমকদাতা ও মহা উপদেষ্টায় হচ্ছে ইহসানের পথ। তিনি বলেন :

"ইহসান হচ্ছে , তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাকে দেখছ ; আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও , তাহলে মনে করবে তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন । (বুখারী ও মুসলিম) । ৩

আর এজন্যই আপনি পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রতি পৃষ্টায় এই মহান উপদেষ্টাকে দেখতে পাবেন , যেমন

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ وَ نَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهٖ نَفۡسُهٗ ۚۖ وَ نَحۡنُ اَقۡرَبُ اِلَیۡهِ مِنۡ حَبۡلِ الۡوَرِیۡدِ
﴿مَا یَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ اِلَّا لَدَیۡهِ رَقِیۡبٌ عَتِیۡدٌ ﴿۱۸ ﴾۱۶﴿

আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর। সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে। (সুরা কাফঃ ১৬ ও ১৮)

﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَیۡهِمۡ بِعِلۡمٍ وَّ مَا کُنَّا غَآئِبِیۡنَ ﴿۷

3 ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হোরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন : বুখারী, ইমান অধ্যায় (كتاب الإيما ن) পরিচ্ছেদ : জিবরাঈল আ. কতৃত নবী

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (باب سوال جبريل النبي صلي الله عليه عن الإيمان) (১/১৮) ; মুসলিম, ইমান অধ্যায় (كتاب الإيمان) ،(১/৩৯) , হাদিস নং - ৯ ; আর ইমাম মুসলিম এই হাদিসখানা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণনা করেছেন, ইমান অধ্যায় (كتاب الإيمان) (১/৩৬) , হাদিস নং – ৮

অতঃপর অবশ্যই আমরা তাদের কাছে পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কাজগুলো বিবৃত করব, আর আমরা তো অনুপস্থিত ছিলাম না। - (সুরা আল আরাফঃ ৭)

مَا تَكُوۡنُ فِیۡ شَاۡنٍ وَّ مَا تَتۡلُوۡا مِنۡهُ مِنۡ قُرۡاٰنٍ وَّ لَا تَعۡمَلُوۡنَ مِنۡ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَیۡكُمۡ شُهُوۡدًا اِذۡ تُفِیۡضُوۡنَ فِیۡهِ ؕ وَ مَا یَعۡزُبُ عَنۡ رَّبِّکَ مِنۡ مِّثۡقَالِ ذَرَّۃٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ وَ لَاۤ اَصۡغَرَ مِنۡ ذٰلِکَ وَ لَاۤ اَكۡبَرَ اِلَّا فِیۡ كِتٰبٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۶۱﴾

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে। আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। - (সুরা ইউনুসঃ ৬১)

اَلَاۤ اِنَّهُمۡ یَثۡنُوۡنَ صُدُوۡرَهُمۡ لِیَسۡتَخۡفُوۡا مِنۡهُ ؕ اَلَا حِیۡنَ یَسۡتَغۡشُوۡنَ ثِیَابَهُمۡ ۙ یَعۡلَمُ مَا یُسِرُّوۡنَ وَ مَا یُعۡلِنُوۡنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِیۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ﴿۵﴾

জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা তাদের বুক ফিরিয়ে নেয়, যাতে তারা তার থেকে আত্মগোপন করতে পারে। জেনে রাখ, যখন তারা কাপড় আবৃত হয়, তখন তিনি জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী।- (সুরা হুদঃ ৫) । আর অনুরূপভাবে আল কুরআনের প্রায় প্রত্যেক স্থানে এই প্রসঙ্গে বর্নিত আছে ।

সৎকর্ম ও অন্যান্য কর্মের মধ্যে পার্থক্য প্রসঙ্গে ইসলাম

আল-কুরআন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সৎকর্ম এমন এক কর্মকে বলা হয়, যাতে তিনটি বিষয়ের সমাবেত ঘটে, তন্মাধ্যে থেকে যখন কোন একটি ত্রুটিপূর্ণ হবে, তবে কিয়ামতের দিন তা দ্বারা ব্যক্তির কোন উপকার হবে না।

প্রথমত: কাজটি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক আনিত বিধান অনুযায়ী হওয়া4 ; কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন :

4, বুখারী, সন্ধির অধ্যায় (كتاب الصلح) পরিচ্ছেদ : যখন তারা অন্যায় সন্ধির উপর মিমাংসা করে, তখন সেই সন্ধি বাতিল বলে গন্য হবে (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردرد) ،(৩/১৬৭) ; মুসলিম, বিচার অধ্যায় (كتاب الأقضية) , পরিচ্ছেদ ; বাতিল বিধানসমূহ খন্ডন করা এবং শরীয়তের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ প্রত্যাখান করা (باب نقض الأ حكام الباطلة ورد حدثات الأمور), (৩/১৩৪৩) , হাদিস নং - ১৭১৮, আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে এমন কিছুর উদ্ভাবন করবে যা তার মধ্যে নেই, তবে তা অগ্রহণযোগ্য হবে " ; অন্য বর্ণনায় আছে, "যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়"। (عائشت رضي الله عنها مرفوعا مد :من أحدث في أمر نا هذا ما ليس فيه فهو رد ، وفي رواية "ما ليس منه) আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় আছে : যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো, যার

ۚ وَ مَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ * وَ مَا نَهٰىكُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا

রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও । - (সুরা আল-হাশরঃ ৭) ; তিনি আর ও বলেনঃ

ۚ مَنۡ یُّطِعِ الرَّسُوۡلَ فَقَدۡ اَطَاعَ اللّٰهَ

যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। - (সুরা আন-নিসাঃ ৮০) ; তিনি আর ও বলেনঃ

قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ

বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর – (সুরা আলে ইমরানঃ ৩১) ; তিনি আর ও বলেনঃ

ؕ اَمۡ لَهُمۡ شُرَکٰٓؤُا شَرَعُوۡا لَهُمۡ مِّنَ الدِّیۡنِ مَا لَمۡ یَاۡذَنۡۢ بِهِ اللّٰهُ

ব্যাপারে আমাদের সমর্থন নেই, তবে সে কর্ম প্রত্যাখ্যান হবে।" (من عمل عملا ليس عليه أمر نا فهورد)

তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? তিনি আর ও বলেনঃ

﴿آللّٰهُ اَذِنَ لَکُمۡ اَمۡ عَلَی اللّٰهِ تَفۡتَرُوۡنَ ﴿۵۹﴾

'আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর তোমরা মিথ্যা রটাচ্ছ' ? – (সুরা ইউনুসঃ ৫৯) ।

দ্বিতিয়তঃ কাজটি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার উদ্দ্যশ্যে হওয়া ; কেননা তিনি বলেনঃ

وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ

তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে । - (সুরা আল-বাইয়্যেনাঃ ৫); তিনি আর বলেনঃ

﴿قُلۡ اِنِّیۡۤ اُمِرۡتُ اَنۡ اَعۡبُدَ اللّٰهَ مُخۡلِصًا لَّهُ الدِّیۡنَ ﴿۱۱﴾ وَ اُمِرۡتُ لِاَنۡ اَکُوۡنَ اَوَّلَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ ﴿۱۲﴾ ﴿اِنِّیۡۤ اَخَافُ اِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّیۡ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ﴿۱۳﴾ قُلِ اللّٰهَ اَعۡبُدُ مُخۡلِصًا لَّهٗ دِیۡنِیۡ ﴿۱۴﴾ فَاعۡبُدُوۡا مَا شِئۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ

বলুন, আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ইবাদাত করতে;

আরও আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আমি যেন প্রথম মুসলিম হই। বলুন, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির। বলুন, আমি ইবাদাত করি আল্লাহরই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছে তার ইবাদত কর। - (সুরা যুমারঃ ১১ – ১৫)

তৃতীয়তঃ কাজটি বিশুদ্ধ আকিদা তথা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হতে হবে । কেননা কাজ হল ছাদের মত, আর আকিদা তথা বিশ্বাস হল ভিতস্বরূপ । আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَ مَنۡ یَّعۡمَلۡ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنۡ ذَکَرٍ اَوۡ اُنۡثٰی وَ هُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓئِکَ یَدۡخُلُوۡنَ الۡجَنَّةَ

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং সে বিশ্বাসীও হয়, তাহলে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে - (সুরা আন-নিসাঃ ১২৪) ; এখানে তিনি সৎকর্মের সাথে (সে ইমানদার অবস্থায়) বলে ইমানের শর্তারোপ করেছেন । আর তিনি অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গে বলেনঃ

﴿وَ قَدِمۡنَاۤ اِلٰی مَا عَمِلُوۡا مِنۡ عَمَلٍ فَجَعَلۡنٰهُ هَبَآءً مَّنۡثُوۡرًا ﴿۲۳
আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। - (সুরা আল-ফুরকানঃ ২৩) তাদের ব্যাপারে তিনি আর ও বলেনঃ

اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ لَیۡسَ لَهُمۡ فِی الۡاٰخِرَۃِ اِلَّا النَّارُ ۫ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِیۡهَا وَ بٰطِلٌ مَّا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾

এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল। - (সুরা হূদঃ ১৬) ্ এগুলো ছাড়াও এ প্রসঙ্গে আর ও অনেক আয়াত রয়েছে ।

শরীয়তের বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করা প্রসঙ্গে

আল-কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, শরীয়তের বিধান ব্যতীত অন্যকে বিচার মানা সুস্পষ্ট কুফরী ও আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক। আর শয়তান যখন মক্কার কাফিরদের প্রত্যাদেশ করল তারা যাতে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, কে তাকে হত্যা করেছে ; জবাবে তিনি বললেন: "তাকে আল্লাহ হত্যা করেছে"। অত:পর শয়তান তাদেরকে আবার প্রত্যাদেশ করল যে তারা যেন তাকে বলে : তোমরা নিজেদের হাতে যা জবাই কর, তা হালাল এবং আল্লাহ তার পবিত্র হাতে যা জবাই করেন তা হারাম? তাহলে তো দেখছি তোমরা আল্লাহর চেয়েও উত্তম 5। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

5, হাদিসখানা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে সনদসমূহ বর্ণনা করেন ইমাম আবু দাউদ, কুরবানীর অধ্যায় (كتاب الأصا حي) , পরিচ্ছেদ : আহলে কিতাবের জবাই প্রসঙ্গে (باب في ذبا ءح أهل الكتاب) (৩/২৪৫) ; হাদিস নং : ২৮১৮ ; তিরমিজি, আল-কুরআনের তাফসীর অধ্যায় (كتاب تفسير القر آن) , পরিচ্ছেদ : সূরা আল-আন'আম থেকে (باب ومن سورة الأنعام) , (৫/২৪৬) , হাদিস নং - ৩০৬৯ ;নাসাঈ, কুরবানীর

﴿وَ اِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ لَیُوۡحُوۡنَ اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓئِهِمۡ لِیُجَادِلُوۡکُمۡ ۚ وَ اِنۡ اَطَعۡتُمُوۡهُمۡ اِنَّکُمۡ لَمُشۡرِکُوۡنَ ﴿۱۲۱
নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক। - (সূরা আল-আন'আম - ১২১) আর (﴾اِنَّکُمۡ لَمُشۡرِکُوۡنَ ﴿۱۲۱) আর বাক্যের শুরুতে ফা (الفاء) সংযুক্ত না হওয়াটা

কসম তথা শপথের ভূমিকাস্বরূপ লাম (لام) উহ্য থাকার উপর প্রকাশ্য ইঙ্গিত। সুতরাং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে শপথ, তিনি এই দ্বারা এই আয়াতের কারীমার মধ্যে এই ব্যাপারে শপথ করেছেন যে, যে ব্যক্তি শয়তানের শরীয়ত ও বিধানের অনুসরণ করে মৃত কে হালালা মনে করবে, সে মুশরিক বলে গণ্য হবে ; আর তা হলো বড় শিরক (شرك أكبر) ,যা মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ করে দিবে। এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

অচিরেই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার এ কথার মাধ্যমে তিরস্কার করবেনঃ

اَلَمۡ اَعۡهَدۡ اِلَیۡکُمۡ یٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ اَنۡ لَّا تَعۡبُدُوا الشَّیۡطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَکُمۡ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ ﴿۶۰﴾ وَّ اَنِ اعۡبُدُوۡنِیۡ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِیۡمٌ ﴿۶۱﴾

হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ। - (সুরা ইয়াসীনঃ ৬০ – ৬১)

আর আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বন্ধুর কথা উদ্ধৃত করে বলেনঃ

یٰۤاَبَتِ لَا تَعۡبُدِ الشَّیۡطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّیۡطٰنَ

হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করবেন না। - (সুরা মারইয়ামঃ 44) অর্থাৎ - কুফুরী ও অবাধ্যতার বিধানে শয়তানের অনুসরন করার মাধ্যমে তার ইবাদত কর না ।

তিনি আর বলেনঃ

اِنۡ یَّدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَ اِنۡ یَّدۡعُوۡنَ اِلَّا شَیۡطٰنًا مَّرِیۡدًا ﴿۱۱۷﴾

তাঁর পরিবর্তে তারা দেবিরাই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরাই পূজা করে। - (সুরা আন-নিসাঃ **১১৭**) ; অর্থাৎ- তারা শুধু শয়তানেরই পূজা করে , তার (শয়তানের) শরীয়ত তথা বিধিবিধানের অনুসরন করার মাধ্যমে ।

তিনি আর ও বলেনঃ

وَ کَذٰلِکَ زَیَّنَ لِکَثِیۡرٍ مِّنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ قَتۡلَ اَوۡلَادِهِمۡ شُرَکَآؤُهُمۡ

আর এভাবে তাদের শরীকরা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করেছে । - (সুরা আল আন’ আমঃ **১৩৭**) । তিনি তাদেরকে তাদের ‘শরীক’ বলে নামকরন করেছেন । কেননা, সন্তানদেরকে হত্যা করার দ্বারা আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তারা তাদেরকে অনুসরন করেছে ।

আর যখন আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদের কে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে। - (সুরা আত তওবাঃ ৩১) , তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জবাবে বললেন যে, তাদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার মানে হল: আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার এবং তিনি যা হারাম করেছেন, তা হালাল করার ব্যাপারে তারা তাদেরকে অনুসরণ করত6। এটা এমন একটি বিষয়, যে ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই। আল কুরআনের ভাষায়ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿۶۰﴾

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। - (সুরা আন-নিসাঃ ৬০) । আল্লাহ তায়ালা আর ও বলেনঃ

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۴﴾

আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। - (সুরা আল মায়িদাঃ 88)

তিনি আর ও বলেন;

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

বলুন, তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ফয়সালাকারী হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন! আর আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, নিশ্চয় এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত। কাজেই আপনি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। - (সুরা আল-আনআমঃ ১১8) ;

আল্লাহ তায়ালা আর ও বলেনঃ

﴿وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّکَ صِدۡقًا وَّ عَدۡلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمٰتِهٖ ۚ وَ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۱۱۵

আর সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্যসমূহ পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। - (সুরা আল আন আমঃ **১১৫**) । এখানে তার বানীতে (صِدۡقًا) অর্থ: সংবাদ দানের ক্ষেত্রে সত্য এবং (وَّ عَدۡلًا) ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ । তিনি আর ও বলেনঃ

﴿اَفَحُکۡمَ الۡجَاهِلِیَّۃِ یَبۡغُوۡنَ ؕ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُکۡمًا لِّقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ ﴿۵۰

তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর? – (সুরা আল-মায়িদাঃ ৫০) ।

সামাজিক অবস্থা প্রসঙ্গে ইসলাম

এ প্রসঙ্গে আল কুরআন অন্তরের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে এবং এর পথ ঘাট আলোকিত করেছে।

আল্লাহ তাআলা প্রধান সমাজপতিকে তার সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি কেমন আচরণ করা নির্দেশ দিয়েছেন, সেদিকে লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন,

وَ اخۡفِضۡ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ

"এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু' মিনের প্রতি বিনয়ী হও" । (সূরা আশ-শু' আরা-২১৫)

তিনি আরো বলেনঃ

فَبِمَا رَحۡمَۃٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ ۚ وَ لَوۡ کُنۡتَ فَظًّا غَلِیۡظَ الۡقَلۡبِ لَانۡفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِکَ ۪ فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَ اسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَ شَاوِرۡهُمۡ فِی الۡاَمۡرِ ۚ فَاِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُتَوَکِّلِیۡنَ

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর

তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন" । (সূরা আলে ইমরানঃ১৫৯)

আর তিনি সাধারণ সমাজকে তার নেতৃবৃন্দের প্রতি কেমন আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, সেদিকে লক্ষ্য করুন। তিনি বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের" ।(সূরা আন-নিসা-৫৯)

আরো লক্ষ্য করুন, তিনি মানুষকে তার বিশেষ সমাজ তথা সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর প্রতি যেমন আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, সেই দিকে; তিনি বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়" ।(সূরা আত-তাহরীম-৬)

আরো লক্ষ করুন তিনি কিভাবে ব্যক্তিকে তার বিশেষ সমাজ থেকে সাবধান ও সংযমী হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; আর তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছেন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারে তার নজরে এলে সে যেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। তিনি প্রথমে তাকেসংযমী ও সজাগ হওয়ার নির্দেশ দেন,তারপর তাকে নির্দেশ দেন ক্ষমা ও মার্জনা করার। তিনি বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন।* অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু" ।(সূরা আত-তাগাবুন-১৪)

আরো লক্ষ্য করুন তিনি সাধারণভাবে সমাজের সকল ব্যক্তিকে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই দিকে; তিনি বলেনঃ

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" ।(সূরা আন-নাহল-৯০) ; তিনি আরো বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللهَ ؕ اِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

"হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু" ।(সূরা আল-হুজুরাত-১২); তিনি আরো বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"হে মু' মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা; ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরণের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম" ।(সূরা আল-হুজুরাত-১১); তিনি আরো বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْىَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللهَ ؕ اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর" ।(সূরা আল-মায়িদা-২); তিনি আরো বলেনঃ

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَۃٌ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَ اَخَوَیۡکُمۡ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ

"নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে" ।(সূরা আল-হুজুরাত-১০)

এ বিষয়ে এগুলো ছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আর যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি এই ধরনের সর্বগ্রাসে ব্যাধি থেকে চিকিৎসার মুখপেক্ষি ,সেটা আল্লাহ তার কিতাবের তিন জায়গায় এই ব্যাধির চিকিৎসা বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মানুষের শত্রুতা থেকে বাঁচার চিকিৎসা হলো তার অসদাচারণকে আচরণকে উপেক্ষা করা এবং সৎ ব্যবহারের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করা; আর জিন শয়তান থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট তার অনিশ্চয়তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন চিকিৎসা নেই।

প্রথম স্থানঃ আল্লাহ তায়ালা সূরা আরাফের শেষে দুষ্ট মানুষের সাথে আচরণবিধি প্রসঙ্গে বলেনঃ

خُذِ الۡعَفۡوَ وَ اۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِیۡنَ

"তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক" । (সূরা আল আ' রাফ-১৯৯)

অনুরূপভাবে জিন শয়তানের সাথে আচরণবিধির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেনঃ

وَ اِمَّا یَنۡزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" । (সূরা আল আ' রাফ-২০০)

দ্বিতীয় স্থানঃ সূরা মুমিনের এক আয়াতের মধ্যে এই প্রসঙ্গে বলেনঃ

اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ السَّیِّئَۃَ ؕ نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا یَصِفُوۡنَ

"যা উত্তম তা দিয়ে মন্দ প্রতিহত কর; তারা যা বলে আমি তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী" ।(সূরা আল-মুমিনুন-৯৬);

অনুরূপভাবে জ্বীন শয়তান সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

وَ اَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ ﴿۹۸﴾ ﴿۹۷﴾وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّیٰطِیْنِ

“আর বল, ‘হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই ’ । আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই। ’ (সূরা আল-মুমিনুন-৯৭-৯৮)

তৃতীয় স্থানঃ সূরা ফুসসিলাত; আর তাতে আল্লাহ তা'আলা আরো বেশি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই আসমানী চিকিৎসা ওই শয়তানি রোগ কে নির্মূল করে দেবে এবং তাতে তিনি আরো একটু বেশি করে বলেছেন যে, আসমানের চিকিৎসা সকল মানুষকে দেয়া হয় না, বরং এটা শুধু ওই ব্যক্তিকেই দেয়া হয় যিনি, সৌভাগ্যের অধিকারী। আল্লাহ তাতে বলেনঃ

وَ لَا تَسۡتَوِی الۡحَسَنَۃُ وَ لَا السَّیِّئَۃُ ؕ اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَیۡنَکَ وَ بَیۡنَهٗ عَدَاوَۃٌ کَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیۡمٌ

“আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু” ।

وَ مَا یُلَقّٰهَاۤ اِلَّا الَّذِیۡنَ صَبَرُوۡا ۚ وَ مَا یُلَقّٰهَاۤ اِلَّا ذُوۡحَظٍّ عَظِیۡمٍ

“আর এটি তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যধারণ করবে, আর এর অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান” ।(সূরা ফুসসিলাত-৩৪-৩৫)

আর জ্বিন শয়তান সম্পর্কে প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

وَ اِمَّا یَنۡزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ

“আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা” ।(সূরা ফুসসিরাত-৩৬)

আর তিনি অন্যান্য জায়গায় বর্ণনা করেন যে ,এই কোমল আচরণ ও নম্র ব্যবহার বিশেষভাবে মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য, কাফেরদের জন্য নয়; আল্লাহ বলেনঃ

اَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ یَّرۡتَدَّ مِنۡکُمۡ عَنۡ دِیۡنِهٖ فَسَوۡفَ یَاۡتِی اللّٰهُ بِقَوۡمٍ یُّحِبُّهُمۡ وَ یُحِبُّوۡنَهٗۤ ۙ اَذِلَّۃٍ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَعِزَّۃٍ عَلَی الۡکٰفِرِیۡنَ ۫ یُجَاهِدُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ لَا یَخَافُوۡنَ لَوۡمَۃَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِکَ فَضۡلُ اللّٰهِ یُؤۡتِیۡهِ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ

“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ ” ।(সূরা আল- মায়িদা-৫৪)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَ مَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ۫ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কান্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন” । (সূরা আল-ফাতাহ-২৯)

আল্লাহ আরো বলেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ

“হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান” ।(সূরা আত তাওবা-৭৩)

কোমলতার জায়গায় কঠোরতা হলো নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি আর কঠোরতার স্থানে কোমলতা হল দুর্বলতার পরিচায়ক ও এক ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন। কবির কবিতায়ঃ

"যখন সহিষ্ণুতার কথা বলা হবে, তখন বল নির্ধারিত স্থান রয়েছে সহিষ্ণুতার,
আর যুবকের অপাত্রে সহিষ্ণুতা প্রকাশ এক প্রকার মূর্খতা"।

অর্থনীতি প্রসঙ্গে ইসলাম

আল কুরআন অর্থব্যবস্থার সেই মূলনীতি সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে, যে নীতিমালার দিকে অর্থনীতির সকল শাখা প্রশাখা ধাবিত। এর ব্যাখ্যা এই যে, অর্থনীতির সকল বিষয়ের দু' টি মূলনীতির দিকে ধাবমানঃ

প্রথমতঃ সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয়তঃ সম্পদ ব্যয়ের খাতসমূহে তা ব্যয় করার ক্ষেত্রে উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি।

সুতরাং লক্ষ্য করুন, কিভাবে আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে ব্যক্তিত্ব ও দ্বীনের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিভিন্ন উপায় ও উপকরণের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জনের পদ্ধতি সমূহ খোলামেলা বর্ণনা করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে সঠিক পথ আলোকপাত করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ اذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার"।(সূরা আল-জুম' আ-১০)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَ اللهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللهَ ؕ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” ।(সূরা আল-মুযযম্মিল-২০)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَ اِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ

“তোমাদের উপর কোন পাপ নেই যে, তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে। সুতরাং যখন তোমরা আরাফা থেকে বের হয়ে আসবে, তখন মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও তোমরা এর পূর্বে অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে” ।(সুরা আল-বাকারা-১৯৮)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু” ।(সূরা আন-নিসা-২৯)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"অতএব তোমরা যে গনীমত পেয়েছ, তা থেকে হালাল পবিত্র হিসেবে খাও, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" ।(সূরা আল-আনফাল-৬৯)

এই প্রসঙ্গে এগুলো ছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

আরও লক্ষ্য করুন, তিনি কিভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যায়িতার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

"আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ রেখো না এবং তা পুরোপুরি প্রসারিত করো না*, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে" ।(সূরা আল-ইসরা-২৯)

তিনি আরো বলেনঃ

وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

"আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে" ।(সূরা আল-ফুরকান-৬৭)

্তিনি আরো বলেনঃ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এ দু' টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বল, 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত' । এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর" ।(সূরা আল-বাকারা-২১৯)

আরো লক্ষ্য করুন, যেই খাতে ব্যয় করা বৈধ নয়, সেই সাথে ব্যয় করতে তিনি কিভাবে নিষেধ করেন; তিনি বলেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۬ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ

“নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তারা নিজদের সম্পদসমূহ ব্যয় করে, আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে। তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর এটি তাদের উপর আক্ষেপের কারণ হবে এরপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে” ।(সূরা আল-আনফাল-৩৬)

রাজনীতি প্রসঙ্গে ইসলাম

আল কুরআন রাজনীতির মূলনীতি ও নির্দেশনা সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে এবং পদ্ধতিসমূহ সুস্পষ্ট করেছে। এর ব্যাখ্যা হলো যে রাজনীতি দুই ভাগে বিভক্তঃ বৈদেশিক রাজনীতি ও অভ্যন্তরীন রাজনীতি।

o বৈদেশিক রাজনীতিঃ তার পরিধি দুটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

এক. শত্রু দমন ও তার ধ্বংস সাধনে পরিপূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করা। আর এই মূলনীতির ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

وَ اَعِدُّوۡا لَهُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّۃٍ وَّ مِنۡ رِّبَاطِ الۡخَیۡلِ تُرۡهِبُوۡنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمۡ وَ اٰخَرِیۡنَ مِنۡ دُوۡنِهِمۡ ۚ لَا تَعۡلَمُوۡنَهُمۡ ۚ اَللّٰهُ یَعۡلَمُهُمۡ ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَیۡءٍ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ یُوَفَّ اِلَیۡكُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ

“আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না” ।(সূরা আল-আনফাল-৬০)

দুই. এ শক্তিকে কেন্দ্র করে পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল ঐল্য গড়ে তোলা। আর এই ব্যাপারে আল্লাহ বলেনঃ

وَ اعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِیۡعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوۡا ۪ وَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَیۡكُمۡ اِذۡ كُنۡتُمۡ اَعۡدَآءً فَاَلَّفَ بَیۡنَ قُلُوۡبِكُمۡ فَاَصۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِهٖۤ اِخۡوَانًا ۚ وَ كُنۡتُمۡ عَلٰی شَفَا حُفۡرَۃٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنۡقَذَكُمۡ مِّنۡهَا ؕ كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰیٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ

“আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু

ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও" । (সূরা আল-ইমরান-১০৩)

আরো বলেনঃ

وَ اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوۡا فَتَفۡشَلُوۡا وَ تَذۡهَبَ رِيۡحُكُمۡ وَ اصۡبِرُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন" ।(সূরা আনফাল-৪৬)

আর এই রাজনৈতিক প্রয়োজনে সন্ধি ও চুক্তি করা এবং প্রয়োজনে সেসব সন্ধি চুক্তি বাতিল করে দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে আল কুরআন স্পষ্ট ব্যাখ্যা সহ বক্তব্য পেশ করেছে; আল্লাহ বলেনঃ

اِلَّا الَّذِيۡنَ عٰهَدۡتُّمۡ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ثُمَّ لَمۡ يَنۡقُصُوۡكُمۡ شَيۡـًٔا وَّ لَمۡ يُظَاهِرُوۡا عَلَيۡكُمۡ اَحَدًا فَاَتِمُّوۡۤا اِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ اِلٰى مُدَّتِهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَّقِيۡنَ

"তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন" । (সূরা আত তাওবা-৭)

আরো বলেনঃ

وَ اِمَّا تَخَافَنَّ مِنۡ قَوۡمٍ خِيَانَةً فَانۡۢبِذۡ اِلَيۡهِمۡ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الۡخَآئِنِيۡنَ

"আর যদি তুমি কোন কওম থেকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, তাহলে (তাদের চুক্তি) তাদের দিকে সোজা নিক্ষেপ কর, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না" ।(সূরা আনফাল-৫৮)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوۡلِهٖۤ اِلَی النَّاسِ یَوۡمَ الۡحَجِّ الۡاَکۡبَرِ اَنَّ اللهَ بَرِیۡٓءٌ مِّنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ۬ۙ وَ رَسُوۡلُهٗ فَاِنۡ تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ۚ وَ اِنۡ تَوَلَّیۡتُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّکُمۡ غَیۡرُ مُعۡجِزِی اللهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ

"আর মহান হজ্জের দিন* মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও" । (সূরা আত তাওবা-৩)

এছাড়াও তিনি তাদের ষড়যন্ত্র ও সুযোগ গ্রহণ থেকে সতর্কতা অবলম্বন ও মুক্ত থাকা নির্দেশ দিয়েছেন; আল্লাহ বলেনঃ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا خُذُوۡا حِذۡرَکُمۡ فَانۡفِرُوۡا ثُبَاتٍ اَوِ انۡفِرُوۡا جَمِیۡعًا

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একসাথে বের হও" ।(সূরা আন-নিসা-৭১)

আওনুরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

o অভ্যন্তরের রাজনীতি

এ রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সমাজের অভ্যন্তরের শান্তি ও নিরাপত্তা সম্প্রসারণ করা ,জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করা এবং প্রত্যেকের কাছে তাদের অধিকার পৌঁছে দেয়া।

ছয়টি মহারণ ও প্রধান উপাদানের উপর ভিত্তি করে অভ্যন্তরের রাজনৈতিক পরিচালিত হয়।

প্রথমতঃ দিনঃ দিনকে রক্ষার্থে শরীয়ত অনেক বিধি-বিধান নিয়ে এসেছে; এজন্য নবী(সাঃ) বলেনঃ

"যে ব্যক্তি তার দিন পরিবর্তন করবে তোমরা তাকে হত্যা কর" । এর মাধ্যমে দ্বীন পরিবর্তন ও বিনষ্ট করার হাত থেকে রক্ষার জন্য পরিপূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ জীবনঃ জীবন রক্ষা করা ও তার নিরাপত্তা বিধানে আল্লাহ আল কুরআন কারীমে মধ্যে কিসাসের বিধান প্রবর্তন করেছেন, তিনি বলেনঃ

وَ لَکُمۡ فِی الۡقِصَاصِ حَیٰوۃٌ یّٰۤاُولِی الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ

“আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে” ।(সূরা আল বাকারা-১৭৯)

তৃতীয়তঃ বিবেক বুদ্ধিঃ আল কুরআনের মধ্যে মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বক্তব্য এসেছে, আল্লাহ বলেনঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَ الۡمَيۡسِرُ وَ الۡاَنۡصَابُ وَ الۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

“হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও” ।(সূরা আল-মায়িদা-৯০)

চতুর্থতঃ বংশঃ বংশকে সঠিকভাবে রক্ষনাবেক্ষনের জন্য আল্লাহ তায়ালা যিনা ব্যাভিচারের মত অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি’ হদের’ বিধান করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيۡ فَاجۡلِدُوۡا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا مِائَةَ جَلۡدَةٍ ۪ وَّ لَا تَاۡخُذۡكُمۡ بِهِمَا رَاۡفَةٌ فِيۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ۚ وَ لۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ

“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ’ টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে” । (সূরা আন-নূর-২)

পঞ্চমতঃ মান-সম্মানঃ মান-সম্মান রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ তায়ালা অপবাদ দাতার জন্য ৮০ টি কশাঘাতের শাস্তি বিধান করেছেন। তিনি বলেনঃ

وَ الَّذِيۡنَ يَرۡمُوۡنَ الۡمُحۡصَنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَاۡتُوۡا بِاَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجۡلِدُوۡهُمۡ ثَمٰنِيۡنَ جَلۡدَةً وَّ لَا تَقۡبَلُوۡا لَهُمۡ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ۙ

“আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক” ।(সূরা আন-নূর-৪)

ষষ্ঠতঃ ধন-সম্পদঃ ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ চোরের হাত কাটার শাস্তির বিধান করেছেন। তিনি বলেনঃ

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ ؕ وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" ।(সূরা আল-মায়িদা-৩৮)

সুতরাং এই কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে সমাজের অভ্যন্তরীণ অ্ভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক সকল স্বার্থ রক্ষার জন্য আল কুরআনের অনুসরণ করাই যথেষ্ট।

ইসলাম শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো "যোগ্য নাগরিক" সৃষ্টি করা, যদিও নাগরিক ও তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন কোন সংজ্ঞা নেই। কেননা, বিভিন্ন জাতির নিকট এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। কোন দেশের এর অর্থ হল অন্যায় ও বিদ্রোহ দমন করা কিংবা বিদ্রোহ দমনে অতন্ত্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করা অথবা সে এমন একজন ভালো লোক যে অন্যায় ও বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না, কোন সময় সে আবেদ হয় যে পার্থিব জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দন্দ্ব- সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে, কোন সময় দেশ প্রেমিক হয় ও নিজস্ব বর্ণ রক্ষার জন্য উম্মাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতদসত্ত্বেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এরা সবাই দেশের যোগ্য নাগরিক। ইসলাম নিজেকে এহেন সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করেনি। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক নয় বরং "যোগ্য মানুষ" গড়ার ব্যাপক সফলতা অর্জন করতে চায়।

মানুষ শব্দটি ব্যাপক মনুষ্যত্ব "অর্থবোধক"। এর অর্থে মানুষ শুধু নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডের নাগরিক নয়, এর উর্ধে উঠে এসে হচ্ছে কেবল 'মানুষই'। কুরআন মানুষকে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে ধারণা দান করতে গিয়ে বলেছেন:

﴿اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾

এটাতো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশমাত্র। - (আত-তাকবীরঃ ২৭) আল্লাহ তায়ালা আর ও বলেনঃ

إن أكثركم خوفاً لله هو أكرمكم عند الله

তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু সে আল্লাহর নিকট ততবেশি সম্মানিত ।

ইসলামের শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, আত্মা বৈষয়িক নৈতিক সর্বদিক ব্যপৃত। ইসলাম মানুষকে শরীর জ্ঞান ও আত্মার সমন্বিত এক পূর্ণ অবয়ব মনে করে। এগুলো সহ তাদের বৈষয়িক ও নৈতিক যাবতীয় কাজের সর্বাত্মক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করাই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য। আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট মানুষের স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট্যের উপর কোন যোগ বিয়োগ করা যায় না। ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো এটি ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবীয় কাঠামো হলো শরীর, আত্মা ও বিবেকের সমন্বিত নাম। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ নয় কিংবা এমন নয় যে একটার সাথে আরেকটা কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামি দৃষ্টিতে আত্মা বিশেষ এক নিয়ামত এবং শরীরের কেন্দ্রবিন্দু ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির বাহন। ইসলামে আত্মা'র প্রশিক্ষণ বলতে বুঝায় সকল কাজ, চিন্তা ও সর্ব অবস্থায় আল্লাহর সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক ও সংযোগ সংঘটিত হওয়া। আল্লাহ মানুষকে অসম্ভব কোন কাজের হুকুম দেন না।

আল্লাহ মানুষকে যথাসাধ্য আল্লাহভিরু হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ

فَاتَّقُوا اللّٰہَ مَا اسۡتَطَعۡتُمۡ

অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, । - (আত তাগাবুনঃ ১৬)

وَ اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَ لۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّہُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ

আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কাজের হুকুম দেন না । (আল বাকারাঃ ১৮৬)

এই ব্যবস্থায় মানুষকে পশুসুলভ জড়বাদী প্রাণী হিসেবে বিবেচনাকারী মতবাদকে অস্বীকার করা হয়, যা মানুষকে যৌনকামনার দিকে আহবান জানায় এবং তাদের উচু মর্যাদা কে অস্বীকার করে তাদেরকে ভোগবাদী প্রাণীতে পরিণত করে এবং তাদের শেষ পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিঃ

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ থেকে আমি নিম্নে এর কয়েকটি পেশ করবো ।

১। শাসন করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর

শাসন করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর, আর কারো নয়। আল্লাহ বলেনঃ

ؕ اِنِ الۡحُکۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ

হুকুম কেবল আল্লাহর কাছে। - (সুরা আল-আনআমঃ ৫৭)

আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیۡدُ ﴿۱۶

তিনি যা ইচ্ছা করেন তা' ই করে থাকেন, (সুরা আল বুরূজ; ১৬)

بِیَدِهٖ مَلَکُوۡتُ کُلِّ شَیۡءٍ

যার হাতে রয়েছে সকল কিছুর রাজত্ব । (সুরা ইয়াসীনঃ ৮৩)

"কোন শক্তি তার ক্ষমতা কে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তিনি লোকদেরকে সাহায্য করেন, কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে না। কোন ব্যক্তি, দল কিংবা রাস্ট্র মানুষের উপর তাদের নিজেদের রচিত আইন চাপিয়ে দিতে পারে না। আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেনঃ

ؕ اِتَّبِعُوۡا مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکُمۡ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ لَا تَتَّبِعُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِیَآءَ

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। - (সুরা আরাফঃ ৩)

আল্লাহ আর ও বলেনঃ

﴿وَ مَنۡ لَّمۡ یَحۡکُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡکٰفِرُوۡنَ ﴿۴۴

আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। (সুরা মায়েদাঃ ৪৪)

এখন একথা পরিস্কার যে , সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং তিনি যাবতীয় ক্ষমতার উৎস ।

২ পরামর্শ

শাসন ব্যবস্থা পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে । কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَ شَاوِرۡهُمۡ فِی الۡاَمۡرِ ۚ

আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। সুরা আলে ইমরানঃ ১৫৯)

আল্লাহ বলেনঃ

وَ اَمۡرُهُمۡ شُوۡرٰی بَیۡنَهُمۡ ۪

নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে । (সুরা আশ শুরাঃ ৩৮)

নবী সাঃ বলেছেনঃ

মুমিনদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত যদি আমি কাউকে আমির নিযুক্ত করতাম তাহলে সে ব্যক্তিগত ইবনে উম্মে আবদ্।

এখন প্রমাণিত হলো যে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য। কেননা, স্বয়ং নবী করিম (সা:) পর্যন্ত পরামর্শ ব্যতীত কাউকে আমির নিয়োগ করার অধিকার রাখেন না। পরামর্শের পদ্ধতি কি হবে ইসলাম তা নির্দিষ্ট করে দেননি। স্বভাবতই স্থান-কাল-পাত্রভেদে পার্থক্য সূচিত হতে পারে। নবী করীম সা: এর সময় তার পাশ্বে উপবিষ্ট তদানীন্তন সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল চিন্তাবিদ সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে ওহী নাজিল হয়নি সেসব ব্যাপারে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে বাকস্বাধীনতা ও জাগতিক কর্ম সংঘটিত করা স্বাধীনতা দিতেন। কেননা, কৃষি ও অন্যান্য জ্ঞানগত ব্যাপারে দৈনন্দিন কাজকর্মের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের প্রায় দেয়ার যোগ্যতা ছিল।

৩। অভিভাবকসুলভ দায়িত্ব

রাষ্ট্রীয় শাসন হচ্ছে অভিভাবকসুলভ দায়িত্ব। শাসক আল্লাহ ও বান্দার নিকট দায়ী থাকবে। শাসক জনগণের বেতনভুক্ত কর্মচারী ও বটে। হাদীসে উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে: তোমাদের প্রত্যেককে জিম্মাদার এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। নেতাও অনুরূপ জিম্মাদার, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু শাসনভার লাভ করার পরে দাঁড়িয়ে বললেন: সে লোকেরা! আমি কাজ করে পরিবারের জন্য উপার্জন করতাম, এখন আমি আপনাদের জন্য কাজ করছি। আপনারা আমার জন্য বায়তুল মাল থেকে একটা ভাতা নির্ধারণ করে দিন।

খলিফার আনুগত্য জাতির উপর কর্তব্য। আল্লাহ বলেন:

أَطِيْعُوا اللهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। (সুরা নিসাঃ ৫৯) তবে অন্যায় কাজে অনুগত করা যাবেনা ।

হাদিসে রয়েছেঃ

আল্লাহর নাফরমানীতে কোন অনুগত্য নেই।

রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতার দায়িত্বানুভূতি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হৃদয়ের গভীরে নাড়া দিয়েছিল খিলাফতের দায়িত্ব তিনি কেঁদে ফেললেন তাঁর কন্যা জিজ্ঞেস করলেন, আব্বা কেন কাঁদছেন? আপনি তো দুনিয়াতে আগাম বেহেশতের সুসংবাদ লাভ করেছেন । তিনি উত্তরে বললেন, ইরাকের রাস্তায় যদি পা পিছলিয়ে কোন গাধা পড়ে যায় সেজন্য আমাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা করতে হবে, কেন আমি উক্ত রাস্তা মেরামত করি নি।

হযরত আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

যদি তোমরা আমাকে সত্যের উপর চলতে দেখ তাহলে আমাকে সাহায্য কর , আর যদি অসত্যের উপর চলতে দেখ তাহলে আমাকে সোজা করে দাও।

৪ । জাতীয় ঐক্য

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার চতর্থ মূলনীতি হল জাতীয় ঐক্য। মিল্লাতে ইসলামীয়া একই উম্মাত । ইমান তাদেরকে একই উম্মাতের অনুসারী করে দিয়েছেন।

কুরআন বলছেঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। (সুরা হুজুরাতঃ ১০

﴿اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمۡ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ۖ وَّ اَنَا رَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُوۡنِ﴾ ৯২

নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার ইবাদাত কর। (সুরা আম্বিয়াঃ ৯২)

হাদিসে এসেছে,

একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানের ভাই, সে তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে না এবং তাকে ঘৃণাও করে না ।

এখানে তারা দীন হচ্ছে উপদেশ " হাদিসে বর্নিত এই নীতির সার্থক বাস্তবায়ন করে , একে অপরকে সৎ উপদেশ দান করে । মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য না হয়ে যদি ছোট খাটো শাখা প্রশাখার পার্থক্য হয় , তাহলে এতে কিছু আসে যায় না , এবং এর জন্য শত্রুতা , বৈরিত্য ও লাঠা লাঠি করা নিষ্প্রয়োজন । কোন এখতেলাফের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের সরাসরি কোন বক্তব্য না পাওয়া গেলে ইজতিহাদ ও গবেষনার মাধ্যমে সমাধান বের করতে হবে এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের সমন্বিত মতামত গ্রহন করে প্রশাসক উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন ।

৫। সাম্য

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পঞ্চম মূলনীতি হল সাম্য । ইসলাম সবার জন্য সাম্যকে ফরয করে দিয়েছেন ।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ وَّ اُنۡثٰى وَ جَعَلۡنٰكُمۡ شُعُوۡبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۡا ؕ اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰكُمۡ ؕ

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। (সুরা হুজুরাতঃ ১৩)

হাদীদের মধ্যে আর ও পরিষ্কার ভাবে এসেছেঃ

মানুষ চিরুনীর দাতের অনুরূপ সমান । অনারবের উপর আরবের কিংবা লালের উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই , হ্যা, পার্থক্য শুধু আল্লাহভীতির ভিত্তিতে । নবী (সাঃ) এর উপর আর ও জোর দিয়ে বলেনঃ

আল্লাহ ইসলামের বদৌলতে বংশের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের মিথ্যা গর্ব ও অহঙ্কার থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন । সব মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট ।

৬ । স্বাধীনতা

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ষষ্ঠ নীতি হচ্ছে স্বাধীনতা । ইসলামে চিন্তা , বিশ্বাস ও বক্তব্যের স্বাধীনতা রয়েছে । এমনকি সত্যের জন্য এবং বাস্তব বিরোধী কিছুর বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করাকে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে । কুরআনে এসেছেঃ

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা কল্যানের দিকে মানুষকে ডাকবে , সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে ।

আল্লাহর নবী বলেনঃ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় দেখবে , সে যেন তার হাত ও শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করে , যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সে বাকশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবে , যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্যায় রোধে অন্তর দিয়ে চিন্তা ফিকির করবে (ঘৃণা করবে কাজকে) আর এই সর্বশেষ স্তরটি হচ্ছে দূর্বল ইমানের পরিচায়ক ।

এই স্বাধীনতা তখন পর্যন্ত হরণ করা যাবেনা যতক্ষন না তা ভাল নিয়ম , নৈতিক চরিত্র ও সাধারনভাবে সর্বজন স্বীকৃত আইনের বিরুদ্ধে চলে । বাক স্বাধীনতা হল মৌলিক বিষয়ঃ

রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

যদি দেখ যে আমার উম্মত যালেমকে “যালেম” বলতে ভয় পায় তাহলে সে উম্মতের কথা ছাড় । অর্থাৎ এই উম্মত দিয়ে কোন কাজ হবে না ।

শহীদ শ্রেষ্ঠ হযরত হামজা একদা দেখলেন যে , জনৈক লোক তার প্রতিবেশিনীর উপর চড়াও হচ্ছে , তখন তিনি তাকে উপদেশ দিলেন ও নিষেধ করলেন এবং পরে হত্যা করে ফেললেন ।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যুদ্ধ , সামাজিক জীবন ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের সমধান সম্পর্কে আমি আর বেশি বলে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না । একথা সত্য যে , এগুলোতেই ইসলামের বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব চাইতে যুক্তিসঙ্গত ।

এ প্রসঙ্গে আমি আল্লাহর নিম্ন বক্তব্যকে অনশ্যই তুলে ধরবঃ

ج ا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا

ছোট বড় সব কিছুর পরিসংখ্যান আল্লাহর কাছে আছে । (সুরা কাহাফ ঃ ৪৯)

পূর্ণতা , জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা , স্থায়িত্ব

অন্যান্য মতাদর্শের তুলনায় ইসলামের তিনটি বৈশিষ্ট্য জানাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট । প্রথম বৈশিষ্ট্য হল , পূর্ণতা । বর্তমান ও ভবিষ্যতে সব মানুষের প্রয়োজন পুরনে এ জীবন ব্যবস্থা সক্ষম ।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল , জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ মর্যাদা । এই আদর্শ জাতীয় জীবনের উচ্চ মর্যাদা সংরক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহন করেছে ।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল স্থায়িত্ব । ইসলামী আইন মানব রচিত আইনের তুলনায় স্থায়ী । স্থান ও কাল ভেদে ইসলামী আইনে মৌলিক বিষয়গুলো পরিবর্তিত না হওয়া সত্ত্বেও সর্বযুগ ও সর্বত্র তা সুম্পর্ন উপযোগী ।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

﴾اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٩

নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক। (সুরা হিজরঃ ৯)

উপসংহারঃ

ইসলামের বিভিন্নমুখী বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য গুলো একই উৎসের দিকে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় আর তা হলো ইসলাম , যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে । যদি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসতো তাহলে এতে পূর্ণতা ও স্থায়িত্বের মত গুনাবলীর সমাবেশ হতো না । এসকল কারনে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র গ্রহনযোগ্য দ্বীন এবং পরকালের মুক্তির একটি মাত্র পথ ।